

আমার! জননি আমার!



বঙ্গ আমার ! জননি আমার !

শ্রীসমীরণ চক্রবর্তী, এম-এ ; বি-টি ; সাহিত্যবিনোদ

তড়িৎ প্রকাশনী
প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতা
১৮ জে, টেমার লেন, কলিকাতা-৯

প্রকাশক ঃ
বি, মজুমদার
১৮ জে, টেমার লেন, কলিকাতা-৯

মূল্য ঃ সাত টাকা পঞ্চাশ পয়সা মাত্র

মুদ্রণে ঃ
শ্রীমা প্রেস, নবদ্বীপ।

সূচীপত্র

বঙ্গ আমার ! জননি আমার ! ধাত্রি আমার ! আমার দেশ,
কেন গো মা তোর শুষ্ক নয়ন, কেন গো মা তোর রুক্ষ কেশ !
কেন গো মা তোর ধূলায় আসন, কেন গো মা তোর মলিন বেশ !
সপ্ত কোটি সন্তান যার ডাকে উচ্চে "আমার দেশ"—
কিসের দুঃখ, কিসের দৈন্য, কিসের লজ্জা, কিসের ক্লেশ !
সপ্ত কোটি মিলিত কণ্ঠে ডাকে যখন "আমার দেশ" !

উদিল যেখানে বুদ্ধ-আত্মা মুক্ত করিতে মোক্ষদ্বার,
আজিও জুড়িয়া অর্ধ-জগৎ ভক্তিপ্রণত চরণে যাঁর ;
অশোক যাঁহার কীর্তি ছাইল গান্ধার হতে জলধি শেষ,
তুই কি না মাগো তাঁদের জননী ! তুই কি না মাগো তাঁদের দেশ ?
কিসের দুঃখ, কিসের দৈন্য, কিসের লজ্জা, কিসের ক্লেশ !
সপ্ত কোটি মিলিত কণ্ঠে ডাকে যখন "আমার দেশ" !

—দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

স্বাধীনতা-সংগ্রামে বাঙালী

"স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে,
কে বাঁচিতে চায় ?
দাসত্ব-শৃঙ্খল বল কে পরিবে পায় হে,
কে পরিবে পায় ?"

সুদীর্ঘ সংগ্রাম, ত্যাগ ও সাধনার মধ্য দিয়ে আমাদের দেশজননী ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করেছে। এর পশ্চাতে রয়েছে লক্ষ লক্ষ দেশপ্রেমিকের জীবনদান। তাঁদের প্রাণের বিনিময়ে অর্জিত হয়েছে এই স্বাধীনতা। দেশজননীর পরাধীনতা সেইসব মুক্তিপাগল মানুষকে উন্মাদ করে তুলেছিল। সেইসব জানা-অজানা দেশপ্রেমিককে আমরা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি। জাতির জীবনে তাঁদের স্মৃতি অক্ষয় হয়ে থাকবে।

ভারতে স্বাধীনতার আন্দোলনের সূত্রপাত আমাদের এই বাংলা দেশেই। বাংলাই সারা ভারতকে পথ দেখিয়েছে। প্রথমেই মনে পড়ে রাজা রামমোহন রায়ের কথা। বর্তমান ভারতের জন্মদাতা রামমোহন। তিনিই প্রথম প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন বিদেশী শাসকের অন্যায়ের বিরুদ্ধে। রামমোহনের নেতৃত্বেই আমাদের সমাজ, ধর্ম ও শিক্ষা সংস্কারের আন্দোলন সার্থক রূপ পেয়েছিল। এই পথে যাঁরা আন্দোলন গড়ে তুললেন, তাঁদের মধ্যে প্রধান ছিলেন সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। দেশের দাবিকে তিনি ভাষা দিয়েছেন। তিনি 'ভারতসভা' নামে একটি সমিতি গঠন করেন। সুরেন্দ্রনাথ একাধারে

ছিলেন বাগ্মী ও লেখক। এর পরেই হল কংগ্রেসের জন্ম। এর প্রথম অধিবেশন হয় বোম্বাই শহরে। কংগ্রেসের প্রথম সভাপতি উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রায় সেই সময়েই বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ' প্রকাশিত হয়। বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দেমাতরম্' সমগ্র ভারতের নরনারীকে জাগিয়ে তুলল নব শক্তিতে। ১৯০২ সালে বাংলাদেশে 'শিবাজীপূজার' যে প্রবর্তন হয়, তাতে বাঙালী ও মারাঠার মিলন ঘটে অন্তরে অন্তরে। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের 'শিবাজী' কবিতা অখণ্ড স্বাধীন ভারত প্রতিষ্ঠায় জাতিকে উদ্বুদ্ধ করল। ১৯০৫ সালের ৭ই আগস্ট সমগ্র বাঙালী জাতি বঙ্গভঙ্গ পরিকল্পনার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায়। 'রাখীবন্ধনের' ধুম পড়ে যায় বাংলার ঘরে ঘরে। বাংলার আকাশে-বাতাসে ছড়িয়ে পড়ে রবীন্দ্রনাথের গান—

"বাংলার মাটি, বাংলার জল, বাংলার বায়ু, বাংলার ফল—
পুণ্য হউক, পুণ্য হউক, পুণ্য হউক হে ভগবান।"

বাঙালীর বিপ্লব-সাধনা বড় দুঃখের সাধনা। বিপ্লবযুগের প্রথম বলি ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল চাকী। অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে প্রাণ হারালেন বাঘা যতীন। প্রতিবাদ জানাতে গিয়ে মৃত্যুকে বরণ করে নিলেন অনশনব্রত যতীন দাস। স্বদেশী আন্দোলনে মনীষী বিপিনচন্দ্র পাল আর ঋষি অরবিন্দের অবদান কখনও ভুলবার নয়। বিপিনচন্দ্রের সিংহনাদে ব্রিটিশ-সিংহও ভীত হয়েছিল। ঋষি অরবিন্দ বললেন—"স্বদেশপ্রেমই পরাধীন জাতির একমাত্র ধর্ম।"

ভারতের জাতীয় আন্দোলনে মহাত্মা গান্ধী পথপ্রদর্শক। তাঁর অহিংস অসহযোগ আন্দোলন সংগ্রামী মানুষকে উদ্বুদ্ধ করেছিল। মহাত্মাজীর ১৯৩০-এর আইন অমান্য আন্দোলনে এবং ১৯৪২-এর

"ভারত ছাড়" আন্দোলনে বাঙালীরা বিশেষভাবে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। দেশজননীর সেবার জন্য সবকিছু ছেড়ে চিত্তরঞ্জন এগিয়ে এলেন। দেশপ্রিয় যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত ও দেশগৌরব সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে জাতীয় সংগ্রাম যে শক্তি অর্জন করেছিল, স্বাধীন ভারতে আজ আমরা তারই সুফল ভোগ করছি। বাংলার লালমোহন ঘোষ, ভূপেন্দ্রনাথ বসু, অম্বিকা মজুমদার, রমেশচন্দ্র দত্ত, রাসবিহারী ঘোষ প্রমুখ বরেণ্য নেতৃবর্গ যেভাবে জাতীয় আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে গেলেন, তা অবিস্মরণীয়। নেতাজী সুভাষচন্দ্রের জাতীয়তাবাদের আদর্শ মূর্তিময় হয়ে উঠেছিল তাঁর পরবর্তী জীবনের বিস্ময়কর প্রত্যক্ষ অভিযানে। ছদ্মবেশে ভারতের সীমান্ত পার হলেন সুভাষচন্দ্র। ভারতের বাইরে গড়ে তুললেন "আজাদ হিন্দ ফৌজ"। মালয়, সিঙ্গাপুর ও ব্রহ্মদেশে প্রবাসী ভারতীয়দের নিয়ে মুক্তি-সংগ্রাম আরম্ভ করলেন। "দিল্লী চলো"—এই ছিল তাঁর সংকল্প। একদিকে নেতাজীর অভিযান, অন্যদিকে মহাত্মাজীর "ভারত ছাড়ো" আন্দোলন —এই দুই মহাশক্তি ইংরেজকে পরাভূত করে। অবশেষে ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট ভারত-ইতিহাসের নবদিগন্তে উদিত হল স্বাধীনতার সূর্য। দিল্লীর লালকেল্লায় আবার স্বাধীন ভারতের স্বাধীন পতাকা উত্থিত হল।

স্বাধীন বাংলা—স্বাধীন ভারত। স্বাধীন বাংলায় গঠনের কাজ চলে দুর্বার গতিতে। গৌরব ও উন্নতির পথ ধীরে ধীরে প্রশস্ত হল। ১৯৪৮-এ নব্য বাংলার স্রষ্টা কর্মযোগী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় কংগ্রেসের সদস্যরূপে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী হলেন। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীরূপে তাঁর অনলস কর্মপ্রচেষ্টা সত্যই বিস্ময়কর। তিনি পশ্চিমবঙ্গের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নতিবিধানে সর্বশক্তি নিয়োগ করেন।

বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ ক্রমোন্নতির পথে যতখানি এগিয়েছে, তার মূলে রয়েছে 'ভারত-রত্ন' বিধানচন্দ্রের বিচক্ষণতা ও দূরদর্শিতা।

"জানি পথ দুর্গম,
জানি, পথ বন্ধুর –
দেখি যদি দেখা পাই
সিন্ধুর।"

অনুশীলনী

১। স্বাধীনতা-সংগ্রামে বাংলার দানের কথা সংক্ষেপে লিখ।

২। (ক) ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের সূত্রপাত কোথায়? এই আন্দোলনের জন্মদাতা কে?

(খ) কয়েকজন বাঙালী স্বাধীনতা-সংগ্রামীর নাম কর।

(গ) 'শিবাজী-পূজা' কি?

(ঘ) 'বন্দেমাতরম্' গানটি কার রচনা? গানটি কোন্ গ্রন্থের অন্তর্গত?

(ঙ) নেতাজী সুভাষচন্দ্র কিভাবে তাঁর আন্দোলন চালিয়েছিলেন? "দিল্লী চলো"—কি?

(চ) স্বাধীন বাংলার রূপকার কে?



ভারতপথিক
রাজা রামমোহন রায়

(১৭৭৪—১৮৩৩ খ্রীঃ)

"বঙ্গের মাথার মণি, ভারতের
বৈজয়ন্ত হার,
নমস্কার ! করি নমস্কার !"

১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই মে হুগলী জেলার রাধানগর গ্রামে রামমোহন জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম রামকান্ত রায় ও মাতার নাম তারিণী দেবী। রামকান্ত রায় মুর্শিদাবাদ নবাবের

অধীনে উচ্চপদের অধিকারী ও ভূ-সম্পত্তির মালিক ছিলেন। পুত্রের শিক্ষা ও চরিত্রগঠনের দিকে তিনি বিশেষ মনোযোগী ছিলেন।

রামমোহনের চোখেমুখে ছিল অসাধারণ দীপ্তি। তিনি সত্যসন্ধানী ও চিরনির্ভীক ছিলেন। রামমোহন প্রথমে বাংলা ও ফার্সী ভাষা শিখতে আরম্ভ করেন। আট বছরের মধ্যেই এ দুটো ভাষা তিনি ভাল করে শিখে ফেলেন। তারপর আরবী ভাষা শিখবার জন্য যান পাটনায়। তিন বছরেই আরবী ভাষায় বিশেষ দক্ষতা অর্জন করেন। রামমোহন সংস্কৃত ভাষা ও নানা শাস্ত্র শিখবার জন্য গেলেন বারাণসীতে। সেখানে তিনি বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ প্রভৃতি নানা-শাস্ত্রে জ্ঞান লাভ করেন। মাত্র ১৬ বছর বয়সে রামমোহন সংস্কৃত পাঠ শেষ করে গৃহে ফেরেন। উপনিষদ পড়তে পড়তে তাঁর ধারণা হল—মূর্তি পূজার প্রয়োজন নেই। রামমোহনের হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে বিরূপ মনোভাব জেনে পিতা রামকান্ত তাঁকে গৃহ থেকে বিতাড়িত করেন। গৃহত্যাগী রামমোহন নানা দেশ ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। এক সময় গেলেন তিব্বতে। সেখানে গিয়ে হিন্দুধর্মের কুসংস্কার সম্বন্ধে আলোচনা করতে থাকেন এবং প্রবল আন্দোলনও চালালেন। তিব্বতের একদল লোক তাঁর কথা শুনে ক্ষেপে গেল। তাঁকে হত্যা করবার চেষ্টা চালাল। এক দয়ালু রমণীর চেষ্টায় কোনপ্রকারে তাঁর জীবন রক্ষা পায়। রামমোহনের কষ্টের কথা শুনে পিতা রামকান্ত তাঁকে গৃহে ফিরিয়ে আনেন। ফিরে এসে রামমোহন হয়ত তাঁর মত পরিবর্তন করবেন—পিতার ছিল এই ধারণা। কিন্তু তা হল না। রামমোহন প্রবলভাবে তাঁর মতবাদ প্রচার করতে লাগলেন। আবার তিনি গৃহ থেকে বিতাড়িত হলেন। এই সময়ে রামমোহনের পিতার মৃত্যু হয়। পিতার সম্পত্তি পাবার কোন অধিকার নেই

বিধর্মী রামমোহনের। মামলা চলল হাইকোর্টে। মা দাঁড়ালেন ছেলের বিরুদ্ধে। জয়ী হলেন রামমোহন। কিন্তু সম্পত্তি না নিয়ে রামমোহন সমস্তই মাকে দিয়ে দিলেন। রামমোহনের এই মহত্ত্ব দেখে মায়ের চোখে জল এল। মা পরাজিত হলেন পুত্রের মহত্ত্বের কাছে।

তারপর সুপণ্ডিত ও তেজস্বী রামমোহন সরকারী চাকরি পেয়ে রংপুরে চলে গেলেন। দীর্ঘ ১৩ বছর সুনামের সঙ্গে চাকরি করে দেশে ফিরে এলেন। দেশের কুসংস্কার দূর করবার জন্য তিনি নিজের জীবনকে উৎসর্গ করেন। ইংরেজরা আমাদের দেশ দখল করে খ্রীষ্টান ধর্ম প্রচার শুরু করে। দলে দলে লোক খ্রীষ্টান হতে লাগল। রামমোহন উদ্বিগ্ন হলেন। ভাবলেন, এই ধর্মত্যাগের হিড়িক বন্ধ করতেই হবে।

শেষে তিনি ব্রাহ্মধর্ম প্রবর্তন করলেন। এর মধ্যে হিন্দুত্ব ছিল অনেকখানি। বেদের উপর নির্ভর করে ব্রাহ্মধর্ম প্রচার করলেন সাধারণ মানুষের মাঝে। এক ব্রহ্ম বা অদ্বৈত ঈশ্বরের উপাসনাই এই ধর্মের মূল কথা। অনেকেই ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করলেন। এই ধর্মের প্রসার পরবর্তীকালে খুব বেশী হয়নি। তবে সেই সময়ে দলে দলে খ্রীষ্টান ধর্ম গ্রহণের পথ রামমোহন বন্ধ করেছিলেন।

রামমোহনের জন্মকালেই বাংলাদেশ বিদেশী শাসনের অধীনে চলে গিয়েছিল। মোঘল শাসন ভেঙ্গে পড়েছে। কোম্পানির রাজত্বের গোড়াপত্তন শুরু হয়েছে। দেশে শিক্ষার অভাব, ফলে নানা কুসংস্কারে দেশ ভরে গেছে। দেশের এই শোচনীয় অবস্থা ও পরাধীনতা রামমোহনকে বিচলিত করল। তিনি দেশ গড়ার কাজে কোমর বেঁধে লেগে পড়লেন।

রামমোহনের আর এক মহৎকীর্তি 'সতীদাহ' প্রথা নিবারণ।

হিন্দুদের মধ্যে তৎকালে এই নিয়ম ছিল যে, স্বামীর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রীকেও স্বামীর সঙ্গে পুড়িয়ে মারতে হবে। তখন ভারতের গভর্ণর ছিলেন লর্ড বেণ্টিঙ্ক। রামমোহন তাঁর সাহায্যে সতীদাহ প্রথা চিরতরে রহিত করেন। রামমোহন বাংলা গদ্যকে বলিষ্ঠ ভিত্তির উপর স্থাপন করেন। তাঁর গদ্য রচনা প্রাঞ্জল ও সাহিত্যরসে পূর্ণ। তিনি ধর্মতত্ত্ব, দর্শন-উপনিষদ, ব্যাকরণ ও সমাজ-সংস্কার বিষয়ে প্রবন্ধ রচনা করেন। 'বেদান্ত গ্রন্থ', 'বেদান্তসার', 'ব্রহ্মোপাসনা', 'গৌড়ীয় ব্যাকরণ' প্রভৃতি গ্রন্থ তিনি রচনা করেন। জাতীয় চেতনার উন্মেষে উচ্চশিক্ষা ও স্ত্রী-শিক্ষার বিস্তারে রামমোহনের প্রয়াস ভুলবার নয়।

১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে দিল্লীর বাদশাহ্ দ্বিতীয় আকবর তাঁহাকে "রাজা" উপাধিতে ভূষিত করেন। আকবরের দূতরূপে রামমোহন ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডে যান। তাঁরই চেষ্টায় দিল্লীর বাদশাহের বার্ষিক ভাতা তিন লক্ষ টাকা মঞ্জুর হয়। ইংলণ্ডে রামমোহনের গম্ভীর পাণ্ডিত্য, ব্যক্তিত্ব ও মনীষায় মুগ্ধ হয়ে বহু লোক তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হন। ইংলণ্ড থেকে রামমোহন যান ফরাসী দেশে। স্বাধীন দেশের মাটিতে পা দিয়ে তিনি আনন্দে নৃত্য শুরু করে দিয়েছিলেন। রামমোহন নিজের তথা বিশ্বের সব দেশ ও জাতিকে সমান চোখে দেখেছেন ও ভালবেসেছেন। এমনি ছিল তাঁর উদারতা, স্বাধীনতা-প্রিয়তা ও বিশ্বপ্রেম। ফ্রান্স থেকে রামমোহন আবার ইংলণ্ডে ফিরে আসেন এবং ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দের ২৭শে সেপ্টেম্বর এই মহাজীবনের পরিসমাপ্তি ঘটে ব্রিস্টল শহরে। সেখানেই তাঁকে সমাধিস্থ করা হয়।

রামমোহন মরেও অমর। আমরা যে বর্তমান ভারতকে দেখছি, তার সূত্রপাত 'ভারত-পথিক' রামমোহনের হাতে। তাই বিদেশের

মাটি তাঁকে হরণ করে নিলেও দেশের মানুষের হৃদয়ে তিনি সর্বকালের রাজা'।

> **"যাঁহার অমর স্থান প্রেমের আসনে**
> **ক্ষতি তাঁর ক্ষতি নয় মৃত্যুর শাসনে।**
> **দেশের মাটির থেকে নিল যাঁরে হরি,**
> **দেশের হৃদয় তাঁকে রাখিয়াছে ধরি।"**

অনুশীলনী

১। রামমোহনের জীবনে নির্ভীকতার পরিচয় দাও।

২। রামমোহনের ধর্মমত প্রচার ও সমাজসংস্কার সম্বন্ধে সংক্ষেপে লিখ।

৩। রামমোহনের স্বাধীনতা-প্রিয়তার পরিচয় দাও।

৪। (ক) রামমোহনের জন্ম হয়—১৭৭৪/১৮২০/১৮২৯ সালে— কোন্‌টি ঠিক বল।

(খ) রামমোহনের মাতা পুত্রের কাছে পরাজিত হলেন —— কেন?

(গ) রামমোহন কার কাছ থেকে 'রাজা' উপাধি পান?

(ঘ) রামমোহন —— খ্রীষ্টাব্দে —— শহরে মারা যান।

৫। (ক) রামমোহনের পিতা ও মাতার নাম কি?

(খ) রামমোহনের শিক্ষার কথা কি জান?

(গ) তিব্বতে রামমোহন কেন বিপদে পড়েন? কেমন করে সেই বিপদ থেকে উদ্ধার পান?

(ঘ) রামমোহন প্রবর্তিত ধর্মের নাম কি? এই ধর্মের মূলকথা কি?

(ঙ) 'সতীদাহ প্রথা' কি? কেমন করে তা রহিত হল?

(চ) রামমোহনের রচিত কয়েকখানি গ্রন্থের নাম কর।

(ছ) রামমোহন ইংলণ্ডে যান কেন?



দয়ারসাগর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

(১৮২০—১৮৭১ খ্রীঃ)

"বীরসিংহের সিংহ-শিশু বিদ্যাসাগর বীর,
উদ্‌বেলিত দয়ারসাগর বীর্যে সুগম্ভীর।"

মেদিনীপুর জেলার এক নিভৃত গ্রাম বীরসিংহ। সেখানে ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দের ২৬শে সেপ্টেম্বর দয়ার সাগর বিদ্যাসাগর জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন খুবই দরিদ্র। গ্রামের পাঠশালায় বিদ্যাসাগরের লেখাপড়ার সূত্রপাত। তিনি ছিলেন খুবই মেধাবী। পুত্রকে আরও লেখাপড়া শেখাতে হবে। তাই ঠাকুরদাস একদিন পুত্রকে নিয়ে চললেন কলকাতায়। পায়ে হেঁটেই চললেন তাঁরা। পায়ে চলার পথের ধারে মাইলস্টোনের সংখ্যা দেখে দেখে বালক ঈশ্বরচন্দ্র এক, দুই, তিন—সব ইংরেজী সংখ্যা শিখে ফেললেন।

কলকাতা এসে ঈশ্বরচন্দ্র সংস্কৃত কলেজে ভর্তি হলেন। কলকাতার বাড়ীতে তাঁকে অত্যন্ত পরিশ্রম করতে হত। দু'বেলা

রান্নার কাজ তিনি নিজের হাতে করতেন, বাসন মাজতেন। এইসব কাজ করতে হত বলে অনেক রাত হয়ে যেত। ঘরে আলোর অভাবে পথে গ্যাসের আলোর নীচে দাঁড়িয়ে তিনি পড়তেন। এত অসুবিধের মধ্যেও ঈশ্বরচন্দ্র পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করতেন। শুধু সংস্কৃতেই তিনি পণ্ডিত হননি ; বাংলা, ইংরেজী এমন কি হিন্দী ভাষাতেও অসাধারণ দক্ষতা লাভ করেছিলেন। মাত্র ২১ বছর বয়সে তিনি নানাশাস্ত্রে পাণ্ডিত্য লাভ করেন। তাই বাংলার পণ্ডিতসমাজ তাঁকে "বিদ্যাসাগর" উপাধিতে ভূষিত করে সম্মানিত করেছিলেন। বিদ্যাসাগর তাঁর কর্মজীবন শুরু করেন সংস্কৃত-কলেজের অধ্যাপকরূপে। পরে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাংলা বিভাগের প্রধান অধ্যাপকরূপে নিযুক্ত হন। বেতন পঞ্চাশ টাকা। এর পর সংস্কৃত কলেজের সহকারী সম্পাদকের কাজ করেন। সেখানকার উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের সঙ্গে তাঁর মতের মিল না হওয়ায় ওখান থেকেও তিনি সরে আসেন। পরে বিদ্যালয়সমূহের পরিদর্শকের পদেও নিযুক্ত হয়েছিলেন। মাইনে পেতেন পাঁচশো টাকা। এই স্বাধীন-চেতা নির্ভীক পুরুষ বিদ্যাসাগরের প্রধান কীর্তি 'মেট্রোপলিটান কলেজ' প্রতিষ্ঠা। এই কলেজই আজ 'বিদ্যাসাগর কলেজ' নামে পরিচিত। তাঁর আন্তরিক চেষ্টাতেই এই দেশে শিক্ষাবিস্তারের পথ সুগম হয়। স্ত্রীশিক্ষা-প্রসারেও তাঁর চেষ্টা বড় কম ছিল না। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সেবায় তাঁর দানের তুলনা নেই। বাংলা-ভাষাকে নূতনভাবে গড়েছিলেন তিনি। তাঁর 'বাংলাপাঠ', 'ব্যাকরণ কৌমুদী', 'সীতার বনবাস', 'বেতাল পঞ্চবিংশতি' প্রভৃতি গ্রন্থ চিরপরিচিত ও আদৃত।

তিনি খুবই মাতৃভক্ত ছিলেন। কথিত আছে, মায়ের আদেশ

পালন করবার জন্য তিনি ঝড়-বৃষ্টি উপেক্ষা করে একদিন ভয়ঙ্কর দামোদর নদ সাঁতার দিয়ে পার হয়েছিলেন। এমনি করে তিনি মাতাপিতাকে ভক্তি করতেন। তাঁর কাছে মাতাপিতাই ছিলেন সাক্ষাৎ দেবতা—অন্নপূর্ণা আর বিশ্বেশ্বর। সমাজসংস্কারের ক্ষেত্রে ঈশ্বরচন্দ্রের ভূমিকা বিস্ময়কর। একে তিনি ছিলেন সেকালের এক ব্রাহ্মণ-সন্তান, তার ওপরে ছিলেন সংস্কৃত-পণ্ডিত। কাজেই তাঁর মত একজন লোক যে, এদেশে বিধবা-বিবাহ প্রবর্তনে অগ্রণী হবেন, সেকথা ভাবতে গেলেও অবাক লাগে। বিদ্যাসাগর ছিলেন সকল সংস্কারমুক্ত, উদার পুরুষ। বাল্যবিধবাদের দুঃখ দেখে তাঁর হৃদয় বিগলিত হল। পুত্র নারায়ণচন্দ্রের সঙ্গে এক বালবিধবার বিবাহ দিতে গিয়ে তিনি তাঁর সহোদর শম্ভুচন্দ্রকে পত্রে লিখেছিলেন—

"আমি দেশাচারের নিতান্ত দাস নহি, নিজের বা সমাজের মঙ্গলের নিমিত্ত যাহা উচিত বা আবশ্যক বোধ হইবেক, তাহা করিব ; লোকের বা কুটুম্বের ভয়ে কদাচ সংকুচিত হইব না।"

বিদ্যাসাগরের চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল—তাঁর অপরিসীম দয়া। তাঁর দয়ার অন্ত ছিল না। তাঁর অর্থে যে কত বিদ্যালয়, হাসপাতাল, গ্রন্থাগার গড়ে উঠেছিল, তার ইয়ত্তা নেই। কত ছাত্র, কত বিধবা, কত কন্যাদায়গ্রস্ত পিতা যে তাঁর দান গ্রহণ করে ধন্য হয়েছিল, তার সংখ্যা নির্ণয় করা কঠিন। পথের ধারে রোগের যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করছে এক রোগী। তাকে দেখে বিদ্যাসাগরের দয়া হল। তখনি রোগীটিকে নিজের কাঁধে উঠিয়ে নিয়ে হাসপাতালের দিকে রওনা হলেন। এইভাবে রাস্তায় পড়ে-থাকা কলেরা রোগীর জীবন রক্ষা হল বিদ্যাসাগরের দয়ায়। তাঁর এই মহত্ব দেখেই লোকে তাঁকে বলত 'দয়ার সাগর'। বিদ্যাসাগর ছিলেন খাঁটি বাঙালী। তাঁর

চলায়, কথায়, আচার-ব্যবহারে, পোশাক-পরিচ্ছদে ফুটে উঠ্‌ত বাঙালীর গৌরব। এই সংস্কারমুক্ত পুরুষ একবার তাঁর অসুস্থ পিতাকে নিয়ে কাশীধামে যান। কাশীধামে থেকেও বিশ্বেশ্বরের মূর্তি দর্শন না করায় পাণ্ডারা ক্ষুব্ধ হয়ে তার কারণ জানতে চায়। উত্তরে তিনি বলেন—"আমার গৃহেই বিশ্বেশ্বর ও অন্নপূর্ণা বিরাজিত। তাঁদের সেবা না করে আমি দেবদেবীর সেবা করতে প্রস্তুত নই। এককথায়, ধর্মের নামে আচার-নিষ্ঠাকে তিনি কখনও প্রশ্রয় দেননি।

এই ক্ষণজন্মা পুরুষ ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে ৭১ বছর বয়সে পরলোকগমন করেন। কিন্তু ইহলোকের মানুষ তাদের অন্তরের মণিকোঠায় শ্রদ্ধার আসনে তাঁকে বসিয়েছে চিরকালের জন্য।

"সাগরে যে অগ্নি থাকে কল্পনা সে নয়,
চক্ষে দেখে অবিশ্বাসীর হয়েছে প্রত্যয়।"

অনুশীলনী

১। বিদ্যাসাগরের ছাত্রজীবন বর্ণনা কর।

২। বিদ্যাসাগর কিরূপে ইংরেজী সংখ্যা শিখেছিলেন?

৩। ঈশ্বরচন্দ্রকে 'বিদ্যাসাগর' উপাধিতে কেন ভূষিত করা হয়?

৪। বিদ্যাসাগরের মাতৃভক্তির একটি গল্প বল।

৫। বিধবা-বিবাহ প্রবর্তন করতে গিয়ে বিদ্যাসাগর তাঁর সহোদরকে কি লিখেছিলেন?

৬। বিদ্যাসাগরকে কেন 'দয়ার সাগর' বলা হয়?

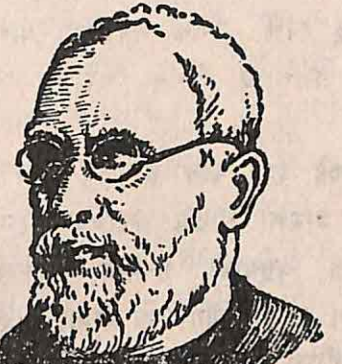
৭। (ক) বিদ্যাসাগরের রচিত দুখানি বই-এর নাম কর।

(খ) বিদ্যাসাগর কাশীধামে বিশ্বেশ্বরের মূর্তি দর্শন করেননি কেন?

(গ) বিদ্যাসাগরের জন্ম —— খ্রীষ্টাব্দে। তাঁর পিতার নাম ——। তিনি —— খ্রীষ্টাব্দে পরলোকগমন করেন।

সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

(১৮৪৮—১৯২৫ খ্রীঃ)



"মহা বিশ্বজীবনের তরঙ্গেতে নাচিতে নাচিতে—
নির্ভয়ে ছুটিতে হবে, সত্যেরে করিয়া ধ্রুবতারা।

সত্যের আলো জ্বালিয়ে যাঁরা ঘর থেকে বেরিয়ে পড়েছে, তাঁদের সামনে দুর্গম পথ। সেই পথে যদি কেউ সাথী না হয়, তবু সেই মহান পথিক একলাই চলে। সে নির্ভীক। শত অত্যাচার বুক পেতে নেয় সে। তেমন এক সত্যাশ্রয়ী জননেতা ছিলেন আমাদের সুরেন্দ্রনাথ। জন্ম ১০ই নভেম্বর, ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতার তালতলা পল্লীতে সুরেন্দ্রনাথের জন্ম। পিতা দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় একজন নামকরা ডাক্তার ছিলেন।

ছেলেবেলা থেকেই সুরেন্দ্রনাথ পাঠে খুবই মনোযোগী ছিলেন।

তিনি যেমন ছিলেন মেধাবী, তেমনি পরিশ্রমী। স্কুল-কলেজের পাঠ ভালভাবে শেষ করে সুরেন্দ্রনাথ গেলেন বিলেতে। তিনি সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা দেবার জন্যে প্রস্তুত হতে লাগলেন। কিন্তু পরীক্ষার ব্যাপারে তাঁকে খুব অসুবিধেয় পড়তে হয়। এই পরীক্ষা দেবার জন্যে যে বয়স ঠিক করা ছিল, সুরেন্দ্রনাথের বয়স ছিল তার চেয়ে কিছু বেশী। অন্য সবরকম যোগ্যতা তাঁর ছিল। কিন্তু ঐ বয়সের ব্যাপারে তিনি পরীক্ষা দেবার অনুমতি পেলেন না।

সুরেন্দ্রনাথ নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে রইলেন না। প্রতিবাদে তিনি মুখর হয়ে উঠলেন। মামলা আরম্ভ করলেন বিলেতের আদালতে। ভারতীয় সময়-তারিখ অনুযায়ী গণনায় সিভিল-সার্ভিস পরীক্ষা দেবার বয়স অপেক্ষা তার বয়স কম প্রমাণিত হল। আদালতের বিচারক তাঁকে পরীক্ষা দেবার অনুমতি দিলেন। পরিশ্রমী, মেধাবী সুরেন্দ্রনাথ ভালভাবে পরীক্ষায় পাশ করে দেশে ফিরে এলেন।

তৎকালীন ইংরেজ সরকার এই নবীন তেজস্বী যুবককে শ্রীহট্ট জেলার সহকারী জেলা-শাসকের পদে বসালেন। শ্রীহট্টে তখন জেলা-শাসকের কাজ করছিলেন একজন ভারতীয় ইংরেজ। তাঁর নাম এইচ. সি. সাদারল্যাণ্ড। আপন কর্তব্যকর্মে সুরেন্দ্রনাথ ছিলেন স্বাধীনচেতা। যা-কিছু সত্য, তাকে প্রকাশ করাই সুরেন্দ্রনাথের ধর্ম। সাদারল্যাণ্ড সাহেব সুরেন্দ্রনাথের কাজে সন্তুষ্ট না হয়ে আদালতে দায়ের করলেন মিথ্যা নালিশ। সুরেন্দ্রনাথ চাকরি থেকে অপসারিত হলেন, কিন্তু ভেঙ্গে পড়লেন না।

আর একটি ঘটনার কথা বলি। তখন কলকাতা হাইকোর্টের

বিচারপতি ছিলেন নরিস্ সাহেব। সুরেন্দ্রনাথ তাঁর কাজের সমালোচনা করে সাহেবের বিরুদ্ধে একটা কড়া প্রবন্ধ লিখলেন দৈনিক ইংরাজী কাগজ "বেঙ্গলী"-তে। এই পত্রিকার সম্পাদনা করতেন সুরেন্দ্রনাথ নিজে। প্রবন্ধ প্রকাশিত হবার পর তৎকালীন ইংরেজ সরকার সুরেন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে আদালতে নালিশ করলেন। আদালত অবমাননার দায়ে তাঁর দু'মাসের জেল হল। কিন্তু জনসাধারণ সুরেন্দ্রনাথের তেজস্বিতায় মুগ্ধ হলেন। তাঁরা দেখলেন —এই তেজস্বী পুরুষের মধ্যে লুকিয়ে আছে দেশের নেতৃত্ব। বরণ করে নিলেন তাঁরা সুরেন্দ্রনাথকে দেশনেতারূপে।

সুরেন্দ্রনাথ তাঁর কয়েকজন সহযোগীকে নিয়ে প্রতিষ্ঠা করেন 'ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন' বা 'ভারতসভা'। এই সভার উদ্দেশ্য ছিল দেশবাসীকে ঐক্যবদ্ধ করা ও দেশে জাতীয় আন্দোলনের সৃষ্টি করা। জনগণকে একথা বোঝাতে সুরেন্দ্রনাথ বিভিন্ন স্থানে বক্তৃতা দিতে থাকেন। দেশবাসী তাঁর এই আহ্বানে জেগে উঠল। এই জাগরণের উপর ভিত্তি করেই পরবর্তী কালে জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা হল। ভারতীয় রাজনীতির ক্ষেত্রে সুরেন্দ্রনাথ তাই 'রাষ্ট্রগুরু' নামে বিখ্যাত হয়েছেন। তিনি দু'বার কংগ্রেসের সভাপতি হয়েছিলেন। ১৮৭৫ সালে তিনি কলকাতা পৌরসভার সভ্য হন ও ১৮৯৩ সালে বঙ্গীয় আইনসভার সদস্য নির্বাচিত হন। তাঁরই চেষ্টায় 'মিউনিসিপ্যাল অ্যাক্ট' পাশ হয়েছিল। ফলে কলকাতার নাগরিকেরা পৌরসভা পরিচালনার অধিকার লাভ করে।

১৯০৫ সালে লর্ড কার্জন বাংলাদেশকে বিভক্ত করেন। কার্জনের এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সমস্ত দেশ বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। এরই

নাম ঐতিহাসিক 'বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন'। সুরেন্দ্রনাথ ছিলেন এই আন্দোলনের নেতা। শেষ পর্যন্ত এই আন্দোলন এমন জোরালো হয়ে ওঠে যে, ইংরেজ শাসকরা বঙ্গভঙ্গ রদ করতে বাধ্য হন।

"যদি হই দীন না হইব হীন, ছাড়িব পরের ভিক্ষা
নব বৎসরে করিলাম পণ লব স্বদেশের দীক্ষা।"

এই স্বদেশের দীক্ষাই দান করে গেছেন আমাদের সুরেন্দ্রনাথ।

অনুশীলনী

১। সুরেন্দ্রনাথ কোথায় জন্মেছিলেন? তাঁর পিতার নাম কি? তাঁর পিতা কি করতেন?

২। সুরেন্দ্রনাথ শ্রীহট্টের সহকারী জেলা-শাসকের পদ থেকে অপসারিত হন কেন?

৩। কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করে সুরেন্দ্রনাথের তেজস্বিতার পরিচয় দাও।

৪। 'ভারতসভা' স্থাপনের উদ্দেশ্য কি ছিল?

৫। সুরেন্দ্রনাথ পরিচালিত পত্রিকার নাম কি?

৬। সুরেন্দ্রনাথকে 'রাষ্ট্রগুরু' বলা হয় কেন?

৭। কলকাতার নাগরিকরা কেমন করে পৌরসভা পরিচালনার অধিকার লাভ করল?

৮। কত সালে 'বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন' হয়েছিল? 'বঙ্গভঙ্গ' কেমন করে রহিত হল?

৯। সুরেন্দ্রনাথের জন্ম হয় — সালে ও — সালে মৃত্যু হয়।



বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ

(১৮৬১—১৯৪১ খ্রীঃ)

"আমি পৃথিবীর কবি, যেথা তার যত উঠে ধ্বনি
আমার বাঁশীর সুরে সাড়া তার জাগিবে তখনি।"

এই পৃথিবীর কবি রবীন্দ্রনাথ জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ী আলো করে জন্মগ্রহণ করেন ১২৬৮ সালের পঁচিশে বৈশাখ। (ইংরাজী ১৮৬১.সালের ৭ই মে)। পিতার নাম মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, মাতার নাম সারদা দেবী। রবীন্দ্রনাথ তাঁদের দেবতার মত ভক্তি করতেন। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন দাস-দাসীতে ভরা বিরাট বাড়ীর ধনীর পুত্র। ঐশ্বর্যের অভাব না থাকলেও অতি সাধারণভাবে তাঁদের শৈশব কেটেছে। বাড়ীর চাকরদের কড়া শাসন ছিল ছেলেদের ওপর। তিনি তাদের কাছে শুনতেন রামায়ণ-মহাভারতের গল্প। নিরিবিলিতে বসে থাকতেন জানলার ধারে আর বাইরের দিকে তাকিয়ে দেখতেন নীলাকাশ, বুড়ো বটগাছ আর পুকুর। কাঠের একটা সিঙ্গি ছিল—তাকে নিয়ে ছেলেবেলায় তিনি ছড়া লিখেছিলেন।

"ছোট কাঠের সিঙ্গি আমার
ছিল ছেলেবেলায়
সেটা নিয়ে গর্ব ছিল বীর-পুরুষি খেলায়।"

রবীন্দ্রনাথের ছেলেবেলার আর একটি কবিতা—

'আমসত্ত্ব দুধে ফেলি, তাহাতে কদলী দলি,
সন্দেশ মাখিয়া দিয়া তাতে—
হাপুস হুপুস শব্দ চারিদিক নিস্তব্ধ
পিঁপড়া কাঁদিয়া যায় পাতে।"

এমনি করে তাঁর কাব্যচর্চা চলছিল। কৈশোরে রবীন্দ্রনাথ তাঁর পিতার সঙ্গে নানা দেশ ঘুরেছেন। কবিতা ও গান রচনায় তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। বালক রবীন্দ্রনাথ একদিন তাঁর পিতাকে গান শোনালেন। খুশী হয়ে মহর্ষি তখনি তাঁকে ৫০০ টাকা উপহার দিয়ে আশীর্বাদ করে বললেন—"দেশের রাজা যদি দেশের ভাষা জানিত, এমন সাহিত্যের কদর বুঝিত, তবে কবিকে পুরস্কৃত করিত।" মাত্র পনেরো বছর বয়সে রবীন্দ্রনাথ ভানুসিংহের পদাবলী' রচনা করেন। রবীন্দ্রনাথ স্কুলের গণ্ডী থেকে নিজেকে মুক্ত করে বাড়ীতেই অধ্যয়ন করতেন। পরবর্তী কালে আইন পড়ার জন্য তিনি বিলেত যান। বিলেতে থাকাকালীন নানা প্রলোভনের মধ্যেও তিনি ভারতীয় আদর্শকে কখনও ভুলে যাননি। দেশপ্রেমের আদর্শ ছিল তাঁর মধ্যে প্রবল। ইংরেজ সরকারের অন্যায় আচরণের বিরুদ্ধে তিনি ছিলেন সদাই মুখর। মহাত্মা গান্ধীও রবীন্দ্রনাথের

দেশপ্রেমের মর্ম বুঝতে পেরেছিলেন। তাই তিনি রবীন্দ্রনাথকে শ্রদ্ধাভরে 'গুরুদেব' বলে সম্বোধন করেন।

রবীন্দ্রনাথ 'হিন্দুমেলার' বিভিন্ন কাজকর্মে ছেলেবেলাতেই যোগদান করেন বাড়ীর অন্যান্য কিশোরদের সঙ্গে। এর মধ্যে তাঁর স্বাদেশিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশন কলকাতায় অনুষ্ঠিত হয়। রবীন্দ্রনাথ এই সম্মেলনে যোগদান করেন এবং এই উপলক্ষে তিনি উদ্বোধন সঙ্গীত 'আমরা মিলেছি আজ মায়ের ডাকে' রচনা করেন। ১৯০৫ সালে লর্ড কার্জন বঙ্গভঙ্গের সংকল্প ঘোষণা করেন। রবীন্দ্রনাথ এর বিরোধিতা করেন এবং বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে সাড়া দিলেন। হিন্দু-মুসলমান ঐক্য প্রতিষ্ঠায় তিনি রাখীবন্ধনের আয়োজন করেছিলেন। তিনি দেশাত্মবোধক সঙ্গীত রচনা করে দেশবাসীকে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন—

"বাংলার মাটি, বাংলার জল—
বাংলার বায়ু, বাংলার ফল—
পুণ্য হউক, পুণ্য হউক, পুণ্য হউক,
হে ভগবান ॥"

'আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি'; 'ও আমার দেশের মাটি, তোমার 'পরে ঠেকাই মাথা'; 'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে, তবে একলা চলো রে'; 'আমি ভয় করব না, ভয় করব না'; 'আমাদের যাত্রা হলো শুরু এখন, ওগো কর্ণধার, তোমারে করি নমস্কার' প্রভৃতি গানের মধ্য দিয়ে কবি এই দেশজননীর বন্দনা করলেন।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর কাব্য ও সাহিত্যের মধ্য দিয়ে শুধু বাংলাদেশকেই যে মুগ্ধ করেছিলেন তা নয়, সারা ভারতবর্ষ তথা সমগ্র বিশ্বের মানুষের কাছে তিনি সম্মানিত হন। ১৯১৩ সালে পৃথিবীর সাহিত্য ক্ষেত্রের শ্রেষ্ঠ সম্মান 'নোবেল পুরস্কার' তাঁর গীতাঞ্জলি কাব্য গ্রন্থের জন্য লাভ করেন। তিনিই বাংলা ভাষা ও বাংলা দেশকে পৃথিবীর দরবারে গৌরবের আসনে বসিয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথ দেশের কোন অপমানকে সহ্য করেননি। ১৯১৩ সালে পাঞ্জাবের জালিয়ানওয়ালাবাগে যখন ইংরেজরা সাধারণ ভারতবাসীর ওপর অকথ্য অত্যাচার চালিয়েছিল, গুলি করে হত্যা করেছিল অসংখ্য নিরীহ মানুষকে, রবীন্দ্রনাথ সেদিন প্রতিবাদে গর্জে উঠলেন। সেই দিনই তিনি 'নাইট' উপাধি প্রত্যাখ্যান করে বড়লাট চেম্‌সফোর্ডকে চিঠি দেন। তাছাড়া মিস্ র‍্যাথবোনের ভারতবিদ্বেষী চিঠির জবাবে রবীন্দ্রনাথ মুখর হয়ে উঠেন। হিজলীর বন্দীশিবিরে দেশের বিপ্লবী যুবকদের ওপর পুলিশের গুলি চালনার বিরুদ্ধে তিনি জ্বালাময়ী ভাষায় প্রতিবাদ করেন। বিদেশী-শাসনের ফলে ভারতের যে বিরাট ক্ষতি হয়েছে, তার পূর্ণ বিবরণ আছে তাঁর 'সভ্যতার সংকট' প্রবন্ধে। রবীন্দ্রনাথ জাতীয়তাবাদের পূজারী হলেও উগ্র জাতীয়তাবাদকে কোন দিনই সমর্থন করেননি। জাতীয়তার চেয়ে মানবতা অনেক বড়। যে জাতীয়তা মানুষের মনে ভালোবাসা ও ঐক্য জাগিয়ে তোলে, তার সমর্থক রবীন্দ্রনাথ। পৃথিবীর মানুষ ও প্রকৃতিকে তিনি ভালবাসতেন—তাই তিনি বিশ্বকবি ও মহামানব। বিশ্বের যেখানেই তিনি গেছেন, ভারতের মৈত্রী, করুণা ও সাম্যের বাণী শুনিয়েছেন। কবির 'শান্তি-নিকেতন' এই বিশ্ববাণীরই উৎসস্বরূপ।

১৩৪৮ সালের ২২শে শ্রাবণের (ইংরেজী ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই আগস্ট) এক বর্ষণমুখর দিনে এই পৃথিবীর কবি অমরধামে যাত্রা করেন। তবু মানুষের মাঝেই তিনি আজও অমর হয়ে আছেন !

"কে বলে গো সেই প্রভাতে নেই আমি,
সকল খেলায় করবে খেলা এই আমি।"

অনুশীলনী

১। রবীন্দ্রনাথের পিতা ও মাতার নাম কি ?
২। কাঠের সিঙ্গিকে নিয়ে কবি কি কবিতা লিখেছিলেন ?
৩। রবীন্দ্রনাথের ছেলেবেলার কথা অল্প কথায় লিখ।
৪। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের পরিচয় দাও।
৫। দেবেন্দ্রনাথ পুত্রকে পুরস্কৃত করলেন কেন ?
৬। অল্প বয়সে রচিত রবীন্দ্রনাথের একখানি কাব্যগ্রন্থের নাম কর।
৭। গান্ধীজী রবীন্দ্রনাথকে কি বলে সম্বোধন করতেন ?
৮। রবীন্দ্রনাথকে কোন্ গ্রন্থের জন্য 'নোবেল পুরস্কার' দেওয়া হয় ?
৯। রবীন্দ্রনাথ 'নাইট' উপাধি ত্যাগ করেন কেন ?
১০। রবীন্দ্রনাথকে 'বিশ্বকবি' বলা হয় কেন ?
১১। এই বছরগুলি স্মরণীয় কেন বল—১৮৬১, ১৯১৩, ১৯৪১।

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র



(১৮৬১—১৯৪৫ খ্রীঃ)

"বিষম ধাতুর মিলন ঘটায়ে বাঙালী দিয়েছে বিয়া,
মোদের নব্য রসায়নে শুধু গরমিলে মিলাইয়া।"

বিজ্ঞানাচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে বর্তমান বাংলাদেশের অন্তর্গত খুলনা জেলার রাড়ুলি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। এই বছরই বঙ্গজননীর আর এক অমূল্য রত্ন জন্মগ্রহণ করেন। তিনি হলেন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। প্রফুল্লচন্দ্রের পিতা হরিশচন্দ্র ছিলেন একজন শিক্ষাবিদ্। তিনি গ্রামে ছেলে ও মেয়েদের জন্য দু'টি পৃথক বিদ্যালয় স্থাপন করেন। তাঁর মায়ের নাম ছিল ভুবনমোহিনী।

বাল্যকাল থেকেই লেখাপড়ার প্রতি প্রফুল্লচন্দ্রের খুব আকর্ষণ ছিল। অত্যধিক পড়াশুনা করার জন্য বালক বয়সেই তাঁর স্বাস্থ্য

ভেঙ্গে পড়ে। প্রথমে গ্রামে পিতার স্কুলে পড়াশুনা করে প্রফুল্লচন্দ্র কলকাতা এসে হেয়ার স্কুলে ভর্তি হন। পরে অ্যালবার্ট স্কুল থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাস করে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর-প্রতিষ্ঠিত মেট্রোপলিটান ইনস্টিটিউশনে ভর্তি হন। বর্তমানে এর নাম 'বিদ্যাসাগর কলেজ'। প্রফুল্লচন্দ্র একই সঙ্গে প্রেসিডেন্সী কলেজেও বিজ্ঞান পড়তেন। কলেজের পড়া শেষ করার আগেই ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে দুষ্প্রাপ্য 'গিলক্রাইস্ট বৃত্তি' লাভ করে তিনি বিলেতে পড়তে যান। তিনি বিলেতে দু'বছর অধ্যয়ন করার পর এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মৌলিক গবেষণার জন্য ডি. এস-সি. উপাধি লাভ করেন। ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রফুল্লচন্দ্র দেশে ফিরে আসেন।

দেশে ফিরে প্রফুল্লচন্দ্র প্রেসিডেন্সী কলেজে রসায়ন-শাস্ত্রের অধ্যাপক হিসেবে যোগদান করেন এবং কলেজের গবেষণাগারে নতুন নতুন গবেষণায় ডুবে রইলেন। অল্পকালের মধ্যেই তাঁর মৌলিক গবেষণা তাঁকে পৃথিবী-বিখ্যাত করল। এই বিজ্ঞান-তাপস শুধু বিজ্ঞানের আবিষ্কারই করেননি, ছাত্রদের মধ্যে বিজ্ঞান-প্রীতির সঞ্চার করেছিলেন। তাঁর ছাত্রদের মধ্যে মেঘনাথ সাহা, জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ, নীলরতন ধর, বিমানবিহারী দে, জিতেন্দ্রনাথ রক্ষিত, বীরেশচন্দ্র গুহ, হেমেন্দ্রকুমার সেন প্রমুখেরা ছিলেন, যাঁরা পরবর্তী কালে বিজ্ঞানচর্চার দ্বারা ভারতের গৌরব বৃদ্ধি করেন। প্রেসিডেন্সী কলেজে চাকরির মেয়াদ শেষ হলে স্যার আশুতোষ তাঁকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'পালিত অধ্যাপক পদে নিযুক্ত করেন। বিজ্ঞান কলেজেরই একটি কক্ষে তিনি থাকতেন, আর সর্বদা পঠন-পাঠনে রত থাকতেন।

প্রফুল্লচন্দ্রের দেশভক্তিও ছিল অসাধারণ। বিলেত থেকে ঘুরে

এলেও পোশাক-পরিচ্ছদে, আচার-আচরণে তিনি ছিলেন খাঁটি বাঙালী। তিনি পোশাক-পরিচ্ছদের নামে অযথা বিলাসিতার বিরোধী ছিলেন। তাঁর একমাত্র চিন্তা ছিল কি করে দেশকে বড় করা যায়, দেশের ছেলেদের প্রকৃত মানুষ করা যায়। গ্রামের চাষী, জেলে, মজুর প্রভৃতি সকলের সঙ্গেই ছিল তাঁর নিবিড় সম্পর্ক। তিনি বলতেন, "দেশকে আমরা মা বলি, দেশের সবাই মায়ের সন্তান, সকলকে কোলে টেনে নিতে হবে।" তিনি জাতিভেদেরও বিরোধী ছিলেন।

প্রাচীন হিন্দুদের মধ্যে রসায়নের যথেষ্ট চর্চা ছিল কিন্তু কালক্রমে তা বিলুপ্ত হয়ে যায়। প্রাচীন ভারতীয় শাস্ত্র মন্থন করে তিনি প্রাচীন হিন্দুদের এই রসায়ন সাধনার বিবরণ সংগ্রহ করে 'হিন্দু রসায়নের ইতিহাস' নামে একখানি মহামূল্যবান গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

প্রফুল্লচন্দ্রের আর এক মহৎ কীর্তি 'বেঙ্গল ক্যামিক্যাল'। এই প্রতিষ্ঠানটি তাঁর বাঙালী-প্রীতি ও দেশপ্রেমের জ্বলন্ত সাক্ষ্য বহন করছে। মাত্র ৮০০ টাকা পুঁজি নিয়ে তিনি এই প্রতিষ্ঠান তৈরি করেন। আজ এটি একটি ভারতের অন্যতম ঔষধ তৈরির প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। চেষ্টা, উদ্যম ও সহিষ্ণুতা থাকলে বাঙালীও যে ব্যবসায় উন্নতি করতে পারে, তা তিনি নিজের হাতে শিল্প গড়ে প্রমাণ করেছেন। তাছাড়া বাংলাদেশের বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তাঁর গভীর যোগাযোগ ছিল। স্বদেশের শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলির কিরূপে উন্নতি করা যায়, তার জন্য তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করে গেছেন। চাকরির জন্য বাঙালী ছেলেরা ছুটোছুটি করছে দেখে তিনি ব্যথিত হতেন। তিনি তাদের নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে স্বাধীনভাবে ব্যবসায় করতে উৎসাহিত করতেন।

প্রফুল্লচন্দ্রের চরিত্রের আর একটি মহনীয় দিক তাঁর দানশীলতা ও সেবাব্রত। ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে খুলনায় দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। এজন্য দুয়ারে দুয়ারে ভিক্ষা করে তিনি তিনলক্ষ টাকা সংগ্রহ করেন। আবার উত্তরবঙ্গের বন্যায় 'বঙ্গীয় সঙ্কট ত্রাণ সমিতি' গঠন করে তিনি সাত লক্ষ টাকা সংগ্রহ করেছিলেন। সোদপুরের খাদি প্রতিষ্ঠানকে তাঁর শেষ জীবনের সঞ্চয় ৫৬ হাজার টাকা দান করে গেছেন। দেশের কল্যাণের জন্য এই দানবীর তাঁর জীবনের সমস্ত সঞ্চয় দান করে গেছেন—নিজের বলতে কিছুই রাখেননি।

এই সর্বত্যাগী চিরকুমার ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দে নশ্বর পৃথিবী ত্যাগ করেন। কিন্তু মানুষের হৃদয়ে তিনি অবিনশ্বর হয়ে আছেন। বাংলার মানুষ তাঁকে কোনদিন ভোলেনি, ভুলবে না।

"সেই ধন্য নরকুলে, লোকে যারে নাহি ভোলে,
মনের মন্দিরে নিত্য সেবে সর্বজন।"

অনুশীলনী

১। প্রফুল্লচন্দ্র কোন্ বৃত্তি পেয়ে বিলেতে যান? সেখানে তিনি কি ডিগ্রি লাভ করেন?

২। প্রফুল্লচন্দ্রের কৃতী ছাত্রদের মধ্যে কয়েকজনের নাম উল্লেখ কর।

৩। প্রফুল্লচন্দ্রের দেশপ্রীতির কয়েকটি পরিচয় দাও।

৪। প্রফুল্লচন্দ্রের দানশীলতার কথা যাহা জান বল।

৫। শিক্ষিত বাঙালী ছেলেদের তিনি কি উপদেশ দিতেন?

৬। (ক) ১৮০১ সাল ভারতের ইতিহাস প্রসিদ্ধ কেন?
(খ) প্রফুলচন্দ্র —— বিশ্ববিদ্যালয় থেকে —— উপাধি পান।
(গ) 'হিন্দু রসায়নের ইতিহাস' কি?
(ঘ) 'বেঙ্গল কেমিক্যাল' কি?
(ঙ) প্রফুল্লচন্দ্র —— খ্রীষ্টাব্দে দেহত্যাগ করেন।

বীর সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দ



(১৮৬৩—১৯০২ খ্রীঃ)

"বীর সন্ন্যাসী বিবেকের বাণী ছুটেছে জগৎময়,
বাঙালীর ছেলে ব্যাঘ্রে বৃষভে ঘটাবে সমন্বয়।"

যে সকল মনীষীর আবির্ভাবে বাংলাদেশ ধন্য হয়েছে এবং জগৎসভায় ভারতবর্ষকে উচ্চ আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছে, স্বামী বিবেকানন্দ তাঁদের মধ্যে অন্যতম। তাঁর পূর্ব নাম ছিল নরেন্দ্রনাথ দত্ত। সন্ন্যাসগ্রহণের পর তিনি 'স্বামী বিবেকানন্দ' নামে পরিচিত হন।

১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতার সিমুলিয়ার বিখ্যাত দত্ত বংশে নরেন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম বিশ্বনাথ দত্ত, মাতা ভুবনেশ্বরী। বালক বয়সে নরেন্দ্রনাথ অতি দুরন্ত প্রকৃতির

ছিলেন। তিনি কলকাতার মেট্রোপলিটন ইন্স্টিটিউশনে লেখাপড়া করেন। সেখান থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে তিনি জেনারেল এসেমব্লিজ কলেজে ভর্তি হন এবং সেই কলেজ থেকে বি. এ. পাশ করেন। ছাত্র হিসাবে তিনি স্কুলে ও কলেজে সমান কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন। কেবল বুদ্ধিতে নয়, নরেন্দ্রনাথ দৈহিক শক্তির ক্ষেত্রেও বিশেষ কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন। আপন প্রতিভায় নরেন্দ্রনাথ শিক্ষকদের প্রশংসা অর্জন করেছিলেন।

ছাত্রজীবনে নরেন্দ্রনাথ ছিলেন নাস্তিক। ঈশ্বর আছেন বলে তাঁর বিশ্বাস ছিল না। ছোটবেলা থেকেই জাতিভেদের প্রতি তাঁর বিশেষ বিতৃষ্ণা ছিল। তাঁর পিতার বৈঠকখানায় নানা জাতির লোকের জন্য পৃথক পৃথক হুঁকা থাকত। একদিন দেখা গেল বালক নরেন্দ্রনাথ বিভিন্ন জাতির হুঁকায় মুখ লাগিয়ে তামাক খাওয়ার অনুকরণ করছেন। পিতা এসে বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন—"কিরে, কি করছিস্?" বালক নরেন্দ্রনাথ সহজভাবে উত্তর দিলেন—"দেখছিলাম জাত যায় কিনা।"

ছেলেবেলার এই মনোভাবই নরেন্দ্রনাথকে সর্বমানব-প্রেমিক করে তুলেছিল। বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নরেন্দ্রনাথের ঈশ্বর সম্পর্কে বিশ্বাস ক্রমশঃ দৃঢ় হতে থাকে। তখন রাণী রাসমণি কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত দক্ষিণেশ্বর কালীমন্দিরে এক পূজারী ব্রাহ্মণ ছিলেন। সেখানে গিয়ে নরেন্দ্রনাথ প্রকৃত গুরুর সন্ধান পেলেন। এই গুরু—শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব। নরেন্দ্রের মনের সকল সংশয় দূর করে তিনি তাঁকে শিষ্যত্বে বরণ করে নিলেন। এখন থেকে নরেন্দ্রনাথ হলেন ত্যাগী সন্ন্যাসী—নাম হল তাঁর স্বামী বিবেকানন্দ।

রামকৃষ্ণ তাঁর প্রিয় শিষ্যকে নূতন বাণী জানালেন। এই বাণী

থেকে বিবেকানন্দ বুঝলেন নিজের মুক্তির জন্য সংসার ত্যাগ করে ঈশ্বর খোঁজা আসল ধর্ম নয়। পৃথিবীর সমস্ত মানুষ ঈশ্বরের সন্তান। তাদের দুঃখকষ্ট দূর করাই হল প্রকৃত ঈশ্বর সেবা।

"বহুরূপে সম্মুখে তোমার, ছাড়ি কোথায় খুঁজিছ ঈশ্বর
জীবে প্রেম করে যেই জন, সেইজন সেবিছে ঈশ্বর।"

এই ধর্মই হল স্বামী বিবেকানন্দের ধর্ম। সকল তীর্থস্থান, হিমালয়ের বিভিন্ন অঞ্চল এবং ভারতবর্ষের বহুস্থান ঘুরে তিনি দেশবাসীর চরম দুঃখদারিদ্র্যের প্রকৃত স্বরূপ বুঝলেন। এইসব মানুষের সেবাকেই তিনি নিজের জীবনের ব্রত বলে গ্রহণ করলেন।

১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে চিকাগো শহরে পৃথিবীর সকল ধর্মের এক মহাসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে হিন্দুধর্মের কোন প্রতিনিধি আমন্ত্রিত হননি। বিবেকানন্দ বিনা নিমন্ত্রণে হিন্দুধর্মের প্রতিনিধিরূপে সেখানে যোগদান করেন এবং হিন্দুধর্ম সম্পর্কে এক জোরাল বক্তৃতা দেন। সকলের সম্মুখে তিনি তুলে ধরলেন বেদের মূল সত্যকে। তিনি ঘোষণা করলেন হিন্দুধর্ম সকল ধর্মের জননি। তাঁর এই ভাষণ শুনে সম্মেলনে সমবেত প্রতিনিধিরা বিস্মিত হন এবং বহু গণমান্য ব্যক্তি তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। তাঁদের মধ্যে ইংলণ্ডের 'মিস মার্গারেট' অন্যতম। ইতি একজন আইরিশ মহিলা। এই মহিয়সী নারী পরে 'ভগিনী নিবেদিতা' নামে জগতে পরিচিতা হয়েছেন। এই সময় স্বামীজির সঙ্গে প্রাচ্য-বিদ্যার বিখ্যাত অধ্যাপক মেক্সমূলারের আলাপ হয়। মেক্সমূলার বিবেকানন্দকে 'রামকৃষ্ণের জীবনী ও উপদেশ গ্রন্থ' লিখতে উৎসাহিত করেন। তারপর ফ্রান্স, সুইজারল্যাণ্ড, জার্মানী ও ইংলণ্ড ঘুরে ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে স্বামীজি দেশের পথে যাত্রা করেন।

দেশে ফিরে স্বামীজি জনসেবাকেই জীবনের ব্রত ও আদর্শরূপে গ্রহণ করলেন। ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বেলুড়মঠে 'রামকৃষ্ণ মিশন' প্রতিষ্ঠা করলেন। এই মিশনের শাখা আজ পৃথিবীর সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে। নারীশিক্ষা বিস্তার, অস্পৃশ্যতা বর্জন, মানবসেবা এবং দেশের মুক্তির জন্য তিনি যে কতখানি আগ্রহী ছিলেন তা তাঁর বিভিন্ন রচনাতেই প্রমাণ পাওয়া যায়। তিনি বলেছিলেন— "আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই।" তিনি প্রায়ই বলতেন "আমি এমন এক ধর্মপ্রচার করিতে চাহি, যাহাতে মানুষ তৈয়ারি হয়।"

১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে স্বামীজি দ্বিতীয়বার পশ্চিম দেশে যাত্রা করেন। ইংলণ্ড, আমেরিকা, ফ্রান্স প্রভৃতি বহু জায়গা ঘুরে তিনি প্রতিষ্ঠা করলেন বেদান্ত প্রচারের কয়েকটি স্থায়ী-কেন্দ্র। দেশে ফিরে এসে আবার তিনি দেশবাসীর সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। জাতিভেদ, ধর্মভেদ দূর করে এক মহান ঐক্যবদ্ধ ভারত গড়ে তোলার স্বপ্ন তিনি দেখেছিলেন। দুর্গতের মধ্যে ভগবানের সাক্ষাৎ লাভ করে তিনি ধন্য হয়েছিলেন। এই জীবনসেবার আদর্শেই তিনি দেশবাসীকে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। সমস্ত ভারতবাসীকে তিনি যে ভ্রাতৃত্বের আদর্শে দীক্ষিত হতে আহ্বান জানিয়েছিলেন, তারই ফলে ভারতবাসী ক্রমে ক্রমে ভারতবর্ষকে স্বদেশ ও মাতৃভূমিরূপে চিনতে শিখেছে। বিবেকানন্দই ভারতবাসীর মধ্যে জাতীয় চেতনার উন্মেষক। সাহিত্যে, কাব্যে, গানে সর্বত্রই তাঁর এই দেশপ্রীতি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। সাহিত্যক্ষেত্রেও স্বামীজির দান অসামান্য। তাঁর বক্তৃতাবলী, প্রবন্ধবলী ও শাস্ত্রীয় আলোচনামূলক গ্রন্থাদি বাংলা সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ।

১৯০২ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা জানুয়ারী মাত্র ৩৯ বছর বয়সে বিবেকানন্দ দেহত্যাগ করেন। তিনি ছিলেন নির্ভীক, তেজস্বী, স্বাধীনতাকামী, মানবদরদী মানুষ। তাঁর প্রতিষ্ঠিত 'রামকৃষ্ণ মিশন' মানুষের মনে আশার আলো সঞ্চার করেছে। সত্যের পূজারী ও সাধক স্বামী বিবেকানন্দ তাই আজ আমাদের কাছে অমর হয়ে আছেন।

স্বামী বিবেকানন্দই আমাদের শেখালেন—

"শুনরে মানুষ ভাই,
সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই।"

অনুশীলনী

১। স্বামী বিবেকানন্দের পূর্বনাম কি ছিল? তাঁর নতুন নামকরণ হয় কখন? তাঁর পিতামাতার নাম কি?

২। বিবেকানন্দের ছেলেবেলার কথা সংক্ষেপে বল।

৩। বিবেকানন্দ কিভাবে দেশের সুনাম বৃদ্ধি করেন?

৪। বিবেকানন্দের ধর্মমত সম্পর্কে কি জান?

৫। জনসেবক বিবেকানন্দের পরিচয় দাও।

৬। কত খ্রীষ্টাব্দে স্বামীজি বেলুড় মঠ প্রতিষ্ঠা করেন?

৭। হিন্দুধর্ম প্রচারের জন্য তিনি কোন্ কোন্ দেশ পরিভ্রমণ করেন?

৮। স্বামী বিবেকানন্দ —— খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর গুরুর নাম ——। স্বামীজির শিষ্যদের মধ্যে —— অন্যতম। —— খ্রীষ্টাব্দের —— তারিখে মাত্র —— বছর বয়সে বিবেকানন্দ দেহত্যাগ করেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত —— মানুষের মনে আশার আলো সঞ্চার করেছে।

———

বাংলার বাঘ আশুতোষ

(১৮৬৪—১৯২৪ খ্রীঃ)



"সেই ধন্য নরকুলে, লোকে যারে নাহি ভুলে,
মনের মন্দিরে যারে পূজে সর্বজন।"

১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দের ২৬শে জুন কলকাতার বৌবাজার অঞ্চলে আশুতোষ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও মাতার নাম জগত্তারিণী দেবী। গঙ্গাপ্রসাদ ছিলেন একজন বিখ্যাত চিকিৎসক। চক্রবেড়িয়ার এক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আশুতোষ লেখাপড়া আরম্ভ করেন। গৃহশিক্ষকের কাছেও তিনি পড়তেন। পাঠশালার পড়া শেষ করে ভর্তি হলেন সাউথ সুবার্বন স্কুলে। তখন শিবনাথ শাস্ত্রী ছিলেন সাউথ সুবার্বন স্কুলের প্রধান শিক্ষক। শৈশবকাল থেকে আশুতোষ ছিলেন খুব মেধাবী। সব সময় লেখাপড়ার কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকতে ভালবাসতেন।

অত্যধিক পড়াশোনার চাপে তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙ্গে যায়। রোজ অধিক রাত পর্যন্ত যাতে পড়াশোনা করতে না পারেন, তার জন্য পিতা গঙ্গাপ্রসাদ আশুতোষকে একবার একটা ঘরে বন্ধ করে রাখেন। সেই বন্ধ ঘর যখন খোলা হল, তখন দেখা গেল আশুতোষ একটা কাঠকয়লা সংগ্রহ করে ঘরের দেওয়ালে ও মেঝেতে শুধু অঙ্ক কষে রেখেছেন। শৈশব থেকেই অঙ্ক বিষয়ের প্রতি তাঁর বিশেষ অনুরাগ ছিল। প্রবেশিকা পরীক্ষায় আশুতোষ দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। বি. এ. পরীক্ষায় তিনি প্রথম স্থান অধিকার করেন। তারপর গণিতশাস্ত্রে এম. এ. পরীক্ষা দিলেন। সেবারেও প্রথম স্থান অধিকার করে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দেন। তারপর পেলেন 'প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ' বৃত্তি। বিলাতের কয়েকটি কাগজে আশুতোষের অঙ্কশাস্ত্র সম্বন্ধে অনেক প্রবন্ধ প্রকাশিত হতে থাকে। দেশ-বিদেশের সর্বত্র আশুতোষের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে।

আশুতোষ শুধু অঙ্কশাস্ত্রেই সুপণ্ডিত ছিলেন না; দর্শন, বিজ্ঞান, আইন ও সাহিত্যের ক্ষেত্রেও তাঁর প্রতিভা বিকশিত হয়েছিল। তিনি 'ডক্টর অব্ ল' উপাধি পেয়েছিলেন আইন সম্বন্ধে গবেষণা করে। মাত্র ২৪ বছর বয়সে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালকমণ্ডলীতে তিনি নির্বাচিত হন। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব প্রকার উন্নতি বিধান করাই ছিল আশুতোষের ধ্যান। কর্মজীবনের আরম্ভ থেকে শেষদিন পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে নানাভাবে তিনি যুক্ত ছিলেন। ১৯০৩ থেকে ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত আশুতোষ পর পর আট বছর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নির্বাচিত হন। তাঁরই অক্লান্ত পরিশ্রম ও দানে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরাট ভবন, বিজ্ঞান কলেজ প্রতিষ্ঠা, পোস্ট গ্রাজুয়েট বিভাগ, মেডিক্যাল

কলেজের বিভিন্ন বিভাগ খোলা সম্ভব হয়েছিল। বাংলাভাষায় এম.এ. পরীক্ষা দেবার ব্যবস্থা তিনিই করেন। বাংলাভাষার মাধ্যমে শিক্ষার ব্যবস্থা তাঁরই চেষ্টায় হয়েছিল। বাংলা দেশের মানুষ চিরকাল এজন্য তাঁকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করবে।

আইন পাশ করে আশুতোষ হাইকোর্টে ওকালতি আরম্ভ করেন। সেখানেও তিনি আপন প্রতিভার পূর্ণ পরিচয় দেন। কিছুদিন পরে হাইকোর্টের বিচারপতির আসন লাভ করেন। এই তেজস্বী দেশপ্রেমিকের জীবন সম্বন্ধে অনেক গল্প আছে। একদিন স্যার আশুতোষ আলিগড় থেকে ট্রেনে আসছিলেন। পথে এক স্টেশনে উঠলেন এক সাহেব। ট্রেন চলেছে। আশুতোষ ঘুমিয়ে পড়েছেন। ধুতি-চাদর পরা বাঙালীকে দেখে সাহেব তো রেগেই আগুন। সাহেব তখন রেগে আশুতোষের নূতন নাগরা জুতো জানলা দিয়ে বাইরে ফেলে দিলেন। কিছুক্ষণ পরে আশুতোষ জেগে উঠে দেখেন তাঁর জুতো নেই। আশুতোষ ব্যাপারটা বুঝতে পেরে তিনিও সাহেবের কোটটি নিয়ে জানলা দিয়ে বাইরে ফেলে দিলেন। সাহেব তখন ঘুমিয়ে। ঘুম থেকে জেগে কোটটি দেখতে না পেয়ে সাহেব খুব চেঁচামিচি শুরু করলেন। তখন আশুতোষ বললেন—'সাহেব, তোমার কোট আমার জুতো আনতে গেছে।" সাহেব তখন আর কি বলবে। এমন তেজস্বী নির্ভীক পুরুষ ছিলেন এই 'বাংলার বাঘ' আশুতোষ।

আশুতোষের মাতৃভক্তি ছিল প্রবল। লর্ড কার্জন আশুতোষকে বিলেত যাবার জন্য আমন্ত্রণ জানান। এতে আশুতোষের মায়ের অমত ছিল। মাতৃভক্ত আশুতোষ লর্ড কার্জনকে জানালেন তাঁর মায়ের অমতের কথা। লর্ড কার্জন লিখলেন—'আপনি আপনার

যাকে জানিয়ে দিন যে, ভারতের বড়লাট আপনাকে বিলেত যেতে আদেশ করেছেন।” বাংলার বাঘ আশুতোষ জানালেন—“মায়ের আদেশই আমার কাছে বড় আদেশ। আমার বিলেত যাওয়া চলবে না।”

এই কর্মবীর নির্ভীক দেশপ্রেমিক ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দের ২৫শে মে পরলোকগমন করেন।

“সেই আলো-শিখা আজো উজ্জ্বল
ঘুচে গেছে সব কালো।”

অনুশীলনী

১। বাল্যকালে আশুতোষকে তাঁর পিতা ঘরে বন্ধ করে রাখেন কেন? তাঁর কি ফল হয়েছিল?

২। আশুতোষের ছাত্রজীবনের কথা বর্ণনা কর।

৩। আশুতোষ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নতির জন্য কি কি করেছেন?

৪। আশুতোষের জীবনে তেজস্বিতার একটি ঘটনা বর্ণনা কর।

৫। আশুতোষ কতদিন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ছিলেন?

৬। আশুতোষের মাতৃভক্তির পরিচয় দাও।

৭। (ক) “সাহেব, তোমার কোট আমার জুতো আনতে গেছে।” —কথাটি কে, কাকে বলেছিলেন? কেন বলেছিলেন, বল।

(খ) ‘আমার বিলেত যাওয়া চলবে না।’—এ কথা কে, কেন বলেছিলেন?

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন



(১৮৭০—১৯২৫ খ্রীঃ)

"নিখিল-চিত্তরঞ্জন তুমি উদিলে
নিখিল দানি'—
মহাবীর কবি, বিদ্রোহী, ত্যাগী,
প্রেমিক, কর্মী, জ্ঞানী।"

নিখিল চিত্তজয়ী চিত্তরঞ্জন ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে ৫ই নভেম্বর কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। পিতা ভুবনমোহন দাশ কলকাতা হাইকোর্টের এটর্নি ছিলেন। চিত্তরঞ্জনের আদি বাড়ি ছিল ঢাকা জেলার তেলিরবাগ গ্রামে। মাত্র তের বছর বয়সে তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাশ করেন। তারপর প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে বি. এ. পাশ করে যান বিলেতে সিভিল সার্ভিস পড়ার জন্য। তখন বিলেতে পার্লামেণ্টের সদস্য নির্বাচনের প্রস্তুতি চলেছে। সদস্য হবার জন্যে প্রার্থী হলেন দাদাভাই নওরোজী। একজন ভারতীয়দের এই ইচ্ছার কথা শুনে ইংরেজরা ক্ষেপে গেল। নওরোজীর নামে নানা কুৎসা

রটাতে লাগল। তাঁকে হেয় করার চেষ্টা চলল। লর্ড সলিসবেরী নওরোজীকে বলে ফেলল 'কালা আদমী'। তাছাড়া পার্লামেণ্টের একজন সদস্য বলল—'বর্বর জাতির দেশ ভারতবর্ষ, আর ভারতবাসী হল গোলামের জাত'। সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার জন্য অধ্যয়নরত চিত্তরঞ্জন সব কথা শুনলেন। তংক্ষণাৎ বই ফেলে দিয়ে বেরিয়ে পড়লেন পথে। লণ্ডন শহরের বুকেই প্রতিবাদ সভা করলেন। তীব্র ভাষায় পার্লামেণ্টের সদস্যটিকে আক্রমণ করলেন তার হীন মন্তব্যের জন্য। বাধ্য হলেন সেই ইংরেজ ভদ্রলোক তাঁর কথা তুলে নিতে। ক্ষমা চাইলেন সকলের সামনে।

চিত্তরঞ্জনের এই তেজস্বীতার কথা লণ্ডনের সব কাগজে প্রকাশিত হল। ইংরেজরা এই স্বাধীনচেতা যুবককে ম্যাজিস্ট্রেটের মত দায়িত্বপূর্ণ পদে বসাতে রাজী হল না। তারা চিত্তরঞ্জনের সিভিল সার্ভিস পড়ার অনুমতি কেড়ে নিল। তারপর চিত্তরঞ্জন ব্যারিস্টারী পাশ করে দেশে ফিরে এলেন। তারপর কলকাতা হাইকোর্টে আইন ব্যবসায় আরম্ভ করলেন।

আলিপুর বোমার মামলায় শ্রীঅরবিন্দ ছিলেন আসামী। চিত্তরঞ্জন দাঁড়ালেন শ্রীঅরবিন্দের পক্ষে। চিত্তরঞ্জনের সওয়ালের প্রভাবে অরবিন্দ বেকসুর খালাস পেলেন। এর পর থেকে দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে পড়ল ব্যারিস্টার চিত্তরঞ্জনের নাম। শোনা যায়, প্রতিদিন তিনি প্রায় আড়াই হাজার টাকা রোজগার করতেন। চিত্তরঞ্জনের মন ছিল কুসুমের মত কোমল। একটি ঘটনা—রাত নিঝুম। তাঁর বাড়ীতে হঠাৎ সোরগোল। একটা চোর ধরা পড়েছে। সবাই মিলে ধরে নিয়ে এল তাকে চিত্তরঞ্জনের কাছে। তিনি বললেন—'চুরি করতে এসেছো কেন?' চোর কথা বলল না। কেঁদে

ফেলল। অমনি চিত্তরঞ্জনের অন্তর কেঁদে উঠল। চোরটাকে নিজের বাড়ীতে কাজ দিলেন।

তিনি ছিলেন দরিদ্রের বন্ধু।

আর একটি ঘটনা—চিত্তরঞ্জন একদিন কোর্টে যাচ্ছেন। এমন সময় এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ তাঁর কন্যাদায়ের কথা চিত্তরঞ্জনের কাছে নিবেদন করলেন। তিনি তাঁকে বিকেলে আসতে বললেন। ব্রাহ্মণ এলে তিনি তাঁকে সেদিনকার সমস্ত উপার্জন হাজার টাকা দান করলেন। এমনি করে দেশের লোককে ভালবেসেই তিনি হলেন 'দেশবন্ধু'। অর্থ, যশ—কোনটারই তাঁর অভাব ছিল না। দেশের প্রতি ছিল তাঁর আন্তরিক ভালবাসা। তিনি বলতেন—"দেশের কাজই আমার ধর্ম।" "স্বাধীনতা মানুষের জন্মগত অধিকার"—এই ছিল তাঁর জীবনের মূলমন্ত্র।

চিত্তরঞ্জনের অন্তরে ছিল খাঁটি স্বদেশপ্রেম। মহাত্মা গান্ধীর ডাকে তিনি আইন ব্যবসায় ছেড়ে যোগ দিলেন দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে। অতুল যশ, অর্থ ছেড়ে এসে দাঁড়ালেন পথে—জনতার মাঝে। জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে দেশের সকল মানুষের নেতা হয়ে উঠলেন। ইংরেজ সরকার ভয় পেয়ে তাঁকে কারারুদ্ধ করল। জেলে আটক অবস্থাতেই তিনি এলাহাবাদে জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি দ্বিতীয়বার কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হন।

আমাদের বাংলা সাহিত্যেও চিত্তরঞ্জনের দান আছে। তাঁর 'মালঞ্চ', 'মালা', 'অন্তর্যামী', 'সাগর সঙ্গীত' প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থগুলি খুব বিখ্যাত। "নারায়ণ" নামে একটি মাসিক পত্রিকারও তিনি সম্পাদনা করতেন।

দেশবন্ধু কলকাতা কর্পোরেশনের মেয়র হয়েছিলেন। দয়ার প্রতিমূর্তি চিত্তরঞ্জন বহু বিপন্ন পরিবারকে অর্থ সাহায্য করতেন। দানবীর চিত্তরঞ্জন তাঁর কলকাতার বাড়ীটাও জাতির সেবায় দান করে গেছেন। সেটা আজ "চিত্তরঞ্জন সেবা সদন।"

১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে ১৬ই জুন মহাবীর, কবি, বিদ্রোহী, ত্যাগী, প্রেমিক ও কর্মী দেশবন্ধু দার্জিলিং-এ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। পরম আত্মীয়কে হারালে মানুষ যেমন কাঁদে—দেশবাসীও তেমনি কেঁদেছিল দেশবন্ধুকে হারিয়ে। এই প্রাণ মৃত্যুহীন।

"এনেছিলে সাথে করে মৃত্যুহীন প্রাণ,
মরণে তাহাই তুমি করে গেলে দান।"

অনুশীলনী

১। চিত্তরঞ্জনের ছাত্রজীবন বর্ণনা কর।

২। ইংরেজরা কেন চিত্তরঞ্জনের সিভিল সার্ভিস পড়ার অনুমতি কেড়ে নিল?

৩। ব্যারিস্টার চিত্তরঞ্জনের নাম কেমন করে ছড়িয়ে পড়ল?

৪। চিত্তরঞ্জনকে "দেশবন্ধু" বলা হয় কেন?

৫। "দেশবন্ধুর মন ছিল কুসুমের মত কোমল।"—কয়েকটি ঘটনার মধ্য দিয়ে বুঝিয়ে দাও।

৬। চিত্তরঞ্জন কিভাবে আইনজীবী হয়েছিলেন?

৭। চিত্তরঞ্জনের কয়েকখানি কাব্যগ্রন্থের নাম কর।



মহাবিপ্লবী মহাঋষি শ্রীঅরবিন্দ

(১৮৭২—১৯৫০ খ্রীঃ)

"ত্যাগ-দীপের ভাস্বর শিখা, জ্বালিলে দীপ্তিময়,
জয়, তব জয় জয় ।"

বিপ্লবযুগের প্রধান ঋত্বিক অরবিন্দ ঘোষ। ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই আগস্ট কলকাতায় শ্রীঅরবিন্দের জন্ম হয়। তাঁর পিতা ছিলেন বিলেত-ফেরত বিখ্যাত ডাক্তার কৃষ্ণধন ঘোষ। তিনি ছিলেন পাশ্চাত্য ভাবধারায় অনুরক্ত। সুবিখ্যাত পণ্ডিত রাজনারায়ণ বসু ছিলেন তাঁর মাতামহ। অরবিন্দের জীবন শুরু হয় পিতার আদর্শ ও ভাবধারা নিয়ে। পাশ্চাত্য শিক্ষার আবেষ্টনীর মধ্যে লালিত-পালিত হওয়ায় তিনি পুরোদস্তুর সাহেব হয়ে উঠেছিলেন। ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর পিতা সপরিবারে বিলেতে গেলেন। লণ্ডনে সেণ্ট পল্‌স্ স্কুলে শ্রীঅরবিন্দ ভর্তি হন। তারপর পড়েন কিংস কলেজে। ইংরেজী ও ফরাসী সাহিত্যপাঠেই ছিল তাঁর বিশেষ আনন্দ। কিংস

কলেজের সর্বোচ্চ পরীক্ষায় পাস করে আই. সি. এস. পরীক্ষার জন্যে প্রস্তুত হতে লাগলেন। তিনি ইংরেজী, গ্রীক, লাতিন, সংস্কৃত প্রভৃতি ভাষায় গভীর পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। সংস্কৃতের মাধ্যমেই ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতি তাঁর অনুরাগ জন্মে। আই. সি. এস. পরীক্ষা দেবার সময় তিনি প্রথমে বাংলা ভাষা শিক্ষা করেন। এই পরীক্ষার সকল বিষয়ে তিনি পাশ করেন। কিন্তু ঘোড়ায় চড়া ভাল জানা না থাকায় তাঁর ম্যাজিস্ট্রেটের চাকরি হল না। এই সময়ে অরবিন্দের পিতার মৃত্যু ঘটে! তিনি বিলেত থেকে ভারতে ফিরে এলেন এবং বরোদার শিক্ষা বিভাগে উঁচু পদে নিযুক্ত হলেন। গাইকোয়াড় শ্রীঅরবিন্দকে খুবই শ্রদ্ধা করতেন। বেশ কিছুদিন শিক্ষা ও রাজস্ব বিভাগে কাজ করে তিনি বরোদা কলেজে ইংরেজীর অধ্যাপক ও সহকারী অধ্যক্ষের কর্মভার গ্রহণ করেন। এরপর বরোদা থেকে চলে এলেন বাংলায়। তাঁর চিন্তা হল কি করে দেশকে স্বাধীন করা যায়; তখন স্বাধীনতার চেতনায় জনগণের মনে বিপুল আন্দোলন চলছে। বাংলা তখন বিদেশী জিনিসের ব্যবহার ত্যাগ করেছে। বাংলা অরবিন্দকে পেয়ে ধন্য হল। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে জড়িয়ে পড়লেন অরবিন্দ। স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে তুলবার জন্যে কলম ধরলেন তিনি 'বন্দেমাতরম্' পত্রিকার মাধ্যমে। এই ইংরেজী পত্রিকার সম্পাদক হলেন নিজে। স্বাধীনতার বাণী প্রচারে অরবিন্দ সফল হয়েছিলেন। তাঁর পশ্চাতে এসে দাঁড়ালেন বারীন ঘোষ, ক্ষুদিরাম চাকী, অবিনাশ ভট্টাচার্য প্রমুখ বীর বিপ্লবী দল। "বন্দে মাতরম্"-এর অগ্নিক্ষরা ভাষা দেখে ইংরেজ শঙ্কিত হল। বন্দী হলেন অরবিন্দ। অনেক চেষ্টা করেও কিন্তু পুলিসের লোক তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণ করতে পারল না। প্রমাণের অভাবে তিনি

ছাড়া পেলেন। এইবার হিংসাত্মক উপায়ে ইংরেজকে দেশছাড়া করার গোপন চেষ্টা চলতে লাগল। এই যুবকদের নেতা ছিলেন অরবিন্দের ভাই বারীন্দ্রকুমার ঘোষ। মাণিকতলায় অরবিন্দের একটা বাগানবাড়ী ছিল। সেখানে তাঁদের গোপন আড্ডায় তৈরী হ'ত ইংরেজ-হত্যার জন্য বোমা।

১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দের ১লা মে। অরবিন্দ তখন ৪৮ নম্বর গ্রে স্ট্রিটের বাড়ীতে থাকতেন। তখন ভোরবেলা। পুলিশ বাড়ীটি ঘিরে ফেলল। ম্যাজিস্ট্রেট ক্রেগান সাহেব পুলিশ ইন্স্‌পেক্টর বিনোদ গুপ্তকে সঙ্গে নিয়ে ভেতরে প্রবেশ করেন। অরবিন্দ তখন একটা ছেঁড়া মাতুরে শুয়ে। ক্রেগান সাহেবের ধারণা ছিল অরবিন্দ একজন দুর্ধর্ষ লোক। তাঁর একার পক্ষে অরবিন্দকে ধরা সম্ভব হবে না। অরবিন্দকে একটা ছেঁড়া মাতুরে বসে থাকতে দেখে তাঁর বিশ্বাসই হয় না, উনিই শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ। বন্দী হলেন শ্রীঅরবিন্দ। শুরু হল ঐতিহাসিক আলিপুর বোমার মামলা। পুরো একবছর অরবিন্দকে হাজতে থাকতে হল। বিপ্লবীদের পক্ষে মামলা পরিচালনার ভার নিলেন তরুণ ব্যারিস্টার দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ। সমগ্র দেশ তাকিয়ে আছে এই মামলার ফলাফলের দিকে। আদালতে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে শ্রীঅরবিন্দ বলেছিলেন—"স্বাধীনতার বাণী উচ্চারণ করা যদি অপরাধ হয়, তাহলে আমি প্রধান অপরাধী। স্বাধীনতা আমার জাগরণের চিন্তা, আমার নিদ্রার স্বপ্ন। আমি স্পষ্ট ভাষায় বলতে চাই—স্বাধীনতার আদর্শ প্রচার করা, আইনের কোন ধারাতেই অপরাধ নয়।" মামলা চলতে লাগল। অবশেষে মামলার শুনানী শেষ হল। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন প্রমাণ করলেন শ্রীঅরবিন্দ নির্দোষ। সসম্মানে মুক্তি পেলেন শ্রীঅরবিন্দ। সেদিনের আদালত কক্ষে

দেশবন্ধু বলেছিলেন—'আজকের এই বিচার সম্পর্কে যেদিন তর্ক-বিতর্কের অবসান হয়ে যাবে, যেদিন সকল আন্দোলন ও উত্তেজনার পরিসমাপ্তি ঘটবে, যখন শ্রীঅরবিন্দও মর্ত্যধামে জীবিত থাকবেন না, সেদিন জগৎবাসী তাঁকে দেশপ্রেমের কবি, জাতীয়তার উদ্গাতা বিশ্বপ্রেমিক বলে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করবে।" দেশবন্ধুর সে ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে সত্য প্রতিপন্ন হয়েছে। নির্জন কারাগারে যখন অরবিন্দ বাস করেছিলেন, তখন থেকেই ঈশ্বর সম্পর্কে নানা অনুভূতি তাঁর মধ্যে জাগতে থাকে। তিনি ক্রমশঃই ঈশ্বরবিষয়ক ভাবনায় ডুবে যাচ্ছিলেন। ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে চন্দননগর হয়ে তিনি পণ্ডিচেরী যাত্রা করেন। সেখানেই তিনি ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত দীর্ঘ চল্লিশ বছর দুশ্চর সাধনা করেন। তাঁর বিশ্ববিখ্যাত গ্রন্থ 'দিব্যজীবন' ও 'সাবিত্রী'র ছত্রে ছত্রে এই ঈশ্বরের অনুভূতির কথাই প্রকাশিত হয়েছে। ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই ডিসেম্বর ১টা ২৬ মিনিটে শ্রীঅরবিন্দ দেহরক্ষা করেন। রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত নমস্কার ক বতার ভাষায় শ্রীঅরবিন্দের বন্দনা করি—

"অরবিন্দ, রবীন্দ্রের লহ নমস্কার।"

অনুশীলনী

১। অরবিন্দের বংশপরিচয় ও শিক্ষাজীবনের কথা বল।

২। অরবিন্দকে কি কি অভিযোগে কারারুদ্ধ করা হয়? তিনি কিরূপে মুক্তি পান?

৩। আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে অরবিন্দ কি বলেছিলেন?

৪। বিপ্লবী অরবিন্দের জীবনকথা লিখ।

বাঘা যতীন



"মুক্তি চাই—মুক্তি চাই
মুক্তি ভিন্ন লক্ষ্য নাই ;
জয় গাহ আজি দেশ-মাতার
জয় গাহ আজি স্বাধীনতার।"

এই মুক্তিপাগল যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের পৈতৃক বাসভূমি ছিল যশোহর জেলার ঝিনাইদহ মহকুমার রিসথালি গ্রামে। তাঁর মামার বাড়ী ছিল নদীয়া জেলায় কুষ্টিয়া মহকুমার কয়া গ্রামে। সেখানেই যতীন্দ্রনাথের জন্ম হয় ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে।

তিনি শৈশবেই পিতাকে হারান। মানুষ হয়েছিলেন মাতুলালয়ে। দেহে প্রচুর শক্তি ছিল তাঁর। সাহসী ও বেপরোয়া ছেলেবেলা থেকেই। শৈশব কাটিয়ে যুবক যতীন্দ্রনাথ একদিন একজন সঙ্গী নিয়ে শিকার করতে বের হলেন বনে। সঙ্গীর হাতে বন্দুক আর যতীন্দ্রনাথের হাতে ভোজালি। জঙ্গলে তাড়া খেয়ে একটা বাঘ

বেরিয়ে এল। সামনে ছিলেন যতীন্দ্রনাথ। বাঘ তাঁর ওপরে পড়ল ঝাঁপিয়ে। লড়াই চলল বাঘে-মানুষে। বাঘ যতীন্দ্রনাথকে কামড়াচ্ছে, আঁচড় দিচ্ছে গায়ে নখ দিয়ে। বীর যতীন্দ্রনাথ ভোজালির কোপ মেরে চলেছেন। যতীন্দ্রনাথের দেহ ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গেল, আর বাঘ মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। মৃতপ্রায় যতীন্দ্রনাথ দীর্ঘদিন হাসপাতালে থেকে ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠলেন। হাতাহাতি লড়াই করে বাঘ মেরেছিলেন বলে তাঁর নাম হল 'বাঘা যতীন'।

আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রামে ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল চাকীর জীবন ব্যর্থ হয়নি। তাঁদেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করে মরণ খেলায় মেতে উঠল শত শত বাঙালী যুবক। বিপ্লবীরা ঠিক করলেন, বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে তাঁরা সংগ্রাম চালিয়ে যাবেন। ইংরেজ রাজত্বের অবসান চাই। এর জন্য চাই অস্ত্র আর সাহসী সৈনিক। শক্তিশালী নেতা না হলে সংগ্রাম চালাবে কে? বিপ্লবীরা একমত হয়ে তাঁদের নেতা করলেন যতীন্দ্রনাথকে।

বিপ্লবী মানবেন্দ্র রায় বিদেশ থেকে অস্ত্র সংগ্রহ করার ভার নিলেন। রাসবিহারী বসু ও শচীন্দ্রনাথ সান্যাল ভারতীয় সৈন্যদের ইংরেজদের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলতে লাগলেন। ভারতীয় সৈন্যরা ইংরেজদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে রাজী হল। ঠিক হল তৎকালীন জার্মান সরকার অস্ত্র যোগাবেন। প্রথমেই তাঁরা দখল করবেন সরকারী অস্ত্রাগার। বিদেশ থেকে আনা অস্ত্র ভারতীয় সৈন্যদের হাতে দেওয়া হবে। বাংলার—মারাঠার—পাঞ্জাবের—সকল প্রদেশের বিপ্লবীদল এক সঙ্গে যুদ্ধ করবেন। হঠাৎ ঘটল অঘটন। ইংরেজ সরকারের এক গুপ্তচর ছিল সৈন্যদলে। সে এই বিদ্রোহের খবর

পৌঁছে দিল সরকারের কাছে। সরকার তৎক্ষণাৎ গোরা সৈন্য দিয়ে সেনানিবাস এবং সব দুর্গ ঘিরে ফেলল। ভারতীয় সৈন্যরা তবু লড়াই করল। তাদের অনেকেই বন্দী হল—বহু সৈন্য প্রাণ হারাল। বিচারে অনেকের ফাঁসি হল।

বিপ্লবীরা কিন্তু এই আক্রমণের জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। এ যেন "অকস্মাৎ বজ্রপাত"। বিপ্লবীদের মধ্যে অনেকে পুলিশের হাতে ধরা পড়ল। কারাপ্রাচীরের অন্তরালে তাদের নিয়ে যাওয়া হল। রাসবিহারী আর মানবেন্দ্র গোপনে পালিয়ে গেলেন ভারতের বাইরে। ময়ূরভঞ্জের এক গভীর বনে যতীন্দ্রনাথ কয়েকজন সাথীকে নিয়ে লুকিয়ে থাকলেন। পুলিশ তাদের ঘিরে ফেলল। যতীন্দ্রনাথ প্রস্তুত হলেন যুদ্ধের জন্যে। সে এক ভীষণ যুদ্ধ। যতীন্দ্রনাথের দলে মাত্র পাঁচজন, আর পুলিশ ও সৈন্যদের সংখ্যা হাজার। পুলিশের অস্ত্র ছিল প্রচুর। যুদ্ধ করতে করতে বিপ্লবীদের বন্দুকের গুলি গেল ফুরিয়ে। সশস্ত্র পুলিশের দল এসে পড়ল নিকটে। সম্মুখ সমরে বীরের মৃত্যুবরণ করলেন যতীন্দ্রনাথ।

"বীরের এ রক্তস্রোত, মাতার এ অশ্রুধারা,
এর যত মূল্য সে কি ধরার ধুলায় হবে হারা।"

অনুশীলনী

১। বাঘা যতীনের পারিবারিক পরিচয় দাও।
২। যতীন্দ্রনাথের নাম 'বাঘা যতীন' হল কেন ?
৩। বাঘা যতীনের বীরত্বের কথা আলোচনা কর।
৪। বিপ্লবীদের ওপর অকস্মাৎ 'বজ্রপাত' হল কেন ?
৫। বাঘা যতীনের সমসাময়িক কয়েকজন বিপ্লবীর নাম কর।
৬। বাঘা যতীন কিভাবে পুলিশের হাতে ধরা পড়লেন এবং কিভাবে মৃত্যুবরণ করলেন ?

বিনয়-বাদল-দীনেশ

"দেশ-মাতার আর বিশ্বমাতার,
ম্লেচ্ছ, কাফের, এক পরিবার ;
নয় তুরস্ক, নয়কো তাতার,
জন্ম-মৃত্যুর এই যে ঠাঁই।"

১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দের ২২শে এপ্রিল চট্টগ্রাম শহর থেকে তিন মাইল দূরে জালালাবাদ পাহাড়ে অমর বিপ্লবীনেতা মাস্টারদার নেতৃত্বে ইংরেজ সৈন্যের সঙ্গে আমাদের বিপ্লবীদের প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়। বীর বিপ্লবীদের রক্তে ধন্য পবিত্র হল আমাদের মাতৃভূমি। "জন্ম-মৃত্যুর এই যে ঠাঁই"—এটা দেশের মানুষ বুঝে গেল অন্তর দিয়ে। সব দেখে-শুনে ইংরেজ সরকার ভয়ে কেঁপে উঠল। তারা বাংলা জুড়ে আরম্ভ করল তল্লাসী আর গ্রেপ্তার। তার সব ক্রোধ গিয়ে পড়ল বিপ্লবীদের ওপর। টেগার্ট সাহেব তখন ছিলেন কলকাতার পুলিশ কমিশনার। তার দুর্দান্ত প্রতাপে সারা বাংলা সন্ত্রস্ত। চলেছে অত্যাচার—উৎপীড়ন—জুলুম, নিরীহ সাধারণ মানুষের ওপর। বিপ্লবীদল গোপন বৈঠকে ঠিক করলেন যে, তারা ঐ টেগার্ট সাহেবকেই দুনিয়া থেকে সরিয়ে দেবেন। কলকাতা ডালহৌসী স্কোয়ারের পথ দিয়ে টেগার্ট সাহেব একদিন যাচ্ছিলেন। বিপ্লবীরা বোমা ছুঁড়ে মারল তাঁর গাড়ী লক্ষ্য করে। তাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হল না। বোমা ফাটলো সাহেবের গাড়ীর ঠিক পেছনে। বেঁচে গেল সাহেব। বোমার আঘাতে বিপ্লবীদের একজন প্রাণ হারাল। আর

একজন আহত অবস্থাতেই বন্দী হল। বিনয়-বাদল-দীনেশদের বিপ্লবীদল সমগ্র ঘটনার পর্যালোচনা করলেন গোপনে। এইপথে যারা একবার নেমেছে, তারা কি চুপ করে থাকতে পারে ?

পুলিশ ইন্স্‌পেক্টর জেনারেল লোম্যান সাহেব তখন ছিলেন ঢাকায়। তাঁর অত্যাচার ও জুলুম কম নয়। হড্‌সন্ সাহেবকে নিয়ে তিনি একদিন ঢাকার হাসপাতাল দেখতে যাচ্ছিলেন। বিপ্লবী বিনয় বসু তখন ঢাকা মিটফোর্ড মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র। তিনি ঐ দুই সাহেবকেই গুলি করলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে পালিয়ে গেলেন। আঘাতে লোম্যান সাহেব মারা গেলেন আর হড্‌সন্ সাহেব ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠলেন। দিকে দিকে পুলিশ, গুপ্তচর ছুটল বিনয়কে বন্দী করতে। সারা বাংলাদেশ তোলপাড় করছে তারা। এদিকে বিনয় তখন গোপন বৈঠকে কলকাতায় বসে মতলব আঁটছেন কি করে ইংরেজ সরকারের প্রধান কার্যালয় রাইটার্স বিল্ডিংস আক্রমণ করা যায়। বিনয়ের সঙ্গী দু'জন—দীনেশ গুপ্ত ও বাদল বোস। তাঁদের পরনে সাহেবী পোশাক। তাঁরা অনায়াসে রাইটার্সে ঢুকে গেলেন। কারও মনে কোন সন্দেহ জাগল না। প্রথমেই ঢুকলেন তাঁরা সিম্পসন্ সাহেবের ঘরে। এই সাহেব ছিলেন কারাবিভাগের পরিদর্শক। এক মনে তিনি কাজ করছিলেন তাঁর টেবিলে। অতর্কিতে বিপ্লবীরা গুলি করল তাঁকে। গুলির আঘাতে তিনি ধরাশায়ী হলেন। গুলির প্রচণ্ড শব্দ শুনে সাহেবের সেক্রেটারি ছুটে এলেন তাঁকে সাহায্য করতে। তিনিও বিপ্লবীদের গুলির আঘাতে প্রাণ হারালেন। সমস্ত বাড়ীটার লোক চঞ্চল হয়ে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে পুলিশবাহিনী এল ছুটে। বিপ্লবীরা তখন বুঝলেন—এ বাড়ী থেকে বের হওয়া কঠিন। তাঁরা তখন একটা ঘরে

ভিতরে ঢুকে খিল এঁটে দিলেন। ইংরেজ সৈন্যের হাতে তাঁরা ধরা দেবেন না—এই ছিল তাঁদের পূর্বপরিকল্পনা। বাদল বিষপান করে আত্মহত্যা করলেন। বিনয় ও দীনেশ ইংরেজদের সঙ্গে প্রচণ্ড যুদ্ধ করে অবশেষে গুলি চালালেন আপন আপন মাথা লক্ষ্য করে। তবু আত্মসমর্পণ তাঁরা কিছুতেই করবেন না। বিনয় মারা গেলেন। অনেক চিকিৎসা করে দীনেশকে বাঁচিয়ে তুলল ইংরেজ সরকার। বিচারে দীনেশের ফাঁসির হুকুম হল। নির্ভীক দীনেশ ফাঁসির মঞ্চে দাঁড়িয়ে উচ্চকণ্ঠে শেষবারের মত বললেন—"বন্দে মাতরম্"···ধীরে ধীরে দীনেশের কণ্ঠ স্তব্ধ হয়ে গেল!

"কায়া নাই, তবু ছায়াখানি তার,
রাখি নয়নের আগে!"

অনুশীলনী

১। জালালাবাদ বিপ্লব কার নেতৃত্বে সংঘটিত হয়েছিল?

২। তখন কলকাতার পুলিশ কমিশনার কে ছিলেন? বিপ্লবীরা তাঁকে মারতে চেয়েছিল কেন?

৩। পুলিশ ইন্স্‌পেক্টর জেনারেল লোম্যানকে কে হত্যা করেন?

৪। লোম্যান সাহেব নিহত হবার পর বিনয়ের পরবর্তী সংকল্প কি ছিল? এই সংকল্পে কারা তাঁর সহযোগী ছিলেন?

৫। 'বিনয়-বাদল-দীনেশ'-এর রাইটার্স অভিযানের কথা লিখ।

নেতাজী সুভাষ

(১৮৯৭— ?)



"যতই তোমায় ভাব ভাবি হে অন্তরে
ততই বিস্ময়-রসে হই নিমগন ॥"

ভারত তথা বিশ্বের বিস্ময় নেতাজী সুভাষ। ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে জানুয়ারী উড়িষ্যার কটক শহরে তাঁর জন্ম হয়। পিতা জানকীনাথ বসু। তিনি ছিলেন কটকের একজন খ্যাতনামা উকিল। কটক থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে সুভাষ কলকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্তি হলেন। ছেলেবেলা থেকেই সুভাষ ছিলেন বিনয়ী ও নম্র। কিন্তু কেউ আঘাত করলে গর্জে উঠতেন সিংহের মত। সুভাষ যখন ঐ কলেজে বি. এ. ক্লাশের ছাত্র, তখন সেখানে ওটেন নামে এক ইংরেজ অধ্যাপক ছিলেন। মিঃ ওটেন একদিন ভারতীয়দের সম্বন্ধে অপমানজনক কথা বলেন। সুভাষ তৎক্ষণাৎ তাঁর প্রতিবাদ করেন এবং সেই অপমানসূচক মন্তব্যের জন্য মিঃ ওটেনকে দুঃখ

প্রকাশ করতে বলেন। উদ্ধত অধ্যাপক তীব্র নিন্দাসূচক মন্তব্য করলেন সুভাষের প্রতি। মর্মাহত সুভাষ অধ্যাপকটিকে দু'-এক ঘা কষে দিলেন। এই অপরাধে সুভাষকে প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে বের করে দেওয়া হল। পরে বাংলার বাঘ আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের চেষ্টায় তিনি কলকাতা স্কটিশ চার্চ কলেজে ভর্তি হলেন। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে দর্শনশাস্ত্রের অনার্সে প্রথম শ্রেণীতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে তিনি বি. এ. পাশ করেন। তখন সামরিক শিক্ষার জন্য ইউনিভার্সিটি ট্রেনিং কোর গঠিত হয়। সুভাষচন্দ্র সেখানে সামরিক শিক্ষা গ্রহণ করেন; তারপর চলে যান বিলেতে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা দেবার জন্য। এই পরীক্ষায় তিনি চতুর্থ স্থান অধিকার করেন এবং কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দর্শনশাস্ত্রে ডিগ্রি লাভ করে ভারতে ফিরে আসেন। এই সময় মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে ভারতে অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয়। তরুণ সুভাষ সরকারী চাকরি না নিয়ে দেশের সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করলেন। মহাত্মাজীর নির্দেশে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে অসহযোগ আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়লেন সুভাষ! ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কলকাতা কর্পোরেশনের প্রধান কর্তা হলেন। সেখানে জনহিতকর কাজে তিনি সকলের প্রশংসা অর্জন করেন। কিন্তু বেশী দিন তিনি কর্পোরেশনের কাজ করতে পারেন নি। শুরু হল কারাবরণের পালা। প্রথমে আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে রাখা হল তাঁকে, পরে সেখান থেকে ব্রহ্মদেশের মান্দালয়ে নির্বাসিত করা হয়। সেখানে অত্যন্ত গরমের জন্য তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়ে। ধীরে ধীরে তিনি শয্যাশায়ী হয়ে পড়েন। তখন তাঁকে কলকাতায় এনে চিকিৎসা করা হয়। আড়াই বছরেরও বেশী কারাবাসের পর ১৯২৭ সালের ১৬ই মে নেতাজীকে মুক্তি দেওয়া হয়। মুক্তিলাভের পর কলকাতা কর্পোরেশন তাঁকে বিপুল সম্বর্ধনা জানান।

১৯২২ থেকে ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত—এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে সুভাষচন্দ্রের কর্মশক্তি ব্যয়িত হয় ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা সংগ্রামে। সংগ্রামের পথে ভারতকে মুক্ত করতে তিনি প্রয়াসী ছিলেন। জাতীয় কংগ্রেসের কর্তৃত্ব গ্রহণ করার পর থেকেই সুভাষচন্দ্রের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রেখেছিলেন ইংরেজ সরকার। সুভাষের আদর্শ ছিল—"মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পতন।" দেশের তরুণ-শক্তির কাছে তিনি ছিলেন এক বিরাট আদর্শের প্রতিমূর্তি। তাঁর জনপ্রিয়তা ছিল অসাধারণ। পর পর দু'বার তিনি কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দামামা যখন বেজে ওঠে, সুভাষচন্দ্র তখন ইংরেজ রাজশক্তির বিরুদ্ধে চরমপত্র দেবার জন্য কংগ্রেসকে পরামর্শ দেন। কংগ্রেসের তরফ থেকে উপযুক্ত সাড়া না পেয়ে সুভাষচন্দ্র কংগ্রেসের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে 'ফরোয়ার্ড ব্লক' নামে আর একটি দল গঠন করেন। অন্যায়ের বিরুদ্ধে আপোসহীন সংগ্রামই ছিল তাঁর জীবনের মূলমন্ত্র। সরকার তখন তাঁকে বন্দী করে রাখেন নিজগৃহে। কিন্তু সকলের দৃষ্টি এড়িয়ে তিনি চলে গেলেন জার্মানীতে। যে-সব দেশ ইংরেজের বিরুদ্ধে যুদ্ধে রত, তাদের সাহায্য নিয়ে ভারতকে স্বাধীন করা সহজ হবে বলে তিনি ভেবেছিলেন। জার্মানী থেকে গেলেন জাপানে। সেখানে রাসবিহারী বসুর সাহায্যে গড়ে তুললেন এক বিরাট সেনাদল। জাপানের হাতে যে-সব ভারতীয় সৈন্য বন্দী হয়েছিল, জাপান সরকার তাদের ছেড়ে দিলেন সুভাষের হাতে। তারা সানন্দে মেনে নিল সুভাষের নেতৃত্ব, অভিবাদন জানাল "নেতাজী" বলে। গড়ে উঠলো 'আজাদ হিন্দ ফৌজ'। তিনি কোটি কোটি মুক্তিকামী ভারতবাসীকে লক্ষ্য করে বললেন, "তোমরা আমাকে রক্ত দাও, আমি তোমাদের স্বাধীনতা দেব।" আজাদ হিন্দ

বাহিনীর "দিল্লী চলো" ধ্বনিতে ইম্ফল-প্রাঙ্গণ মুখরিত হল ; কোহিমা-মণিপুর প্রভৃতি অঞ্চলে স্বাধীন ভারতের পতাকা উত্তোলিত হ'ল। সুভাষের এই কীর্তিকলাপের কথা যখন ছড়িয়ে পড়লো ভারতে, তখন ভারতবাসী দ্বিগুণ উৎসাহিত হল। ইতিপূর্বে মহাত্মা গান্ধীর "ভারত ছাড়ো" আন্দোলনের প্রতিক্রিয়ার গুরুত্ব ইংরেজ সরকার বুঝেছিলেন। কোন উপায় না দেখে ইংরেজ সরকার ক্ষমতা হস্তান্তর করতে বাধ্য হলেন। দেশ স্বাধীন হল ১৯৪৭-এর ১৫ই আগস্ট।

নেতাজীর স্বপ্ন সফল হল। কিন্তু স্বাধীন ভারত ফিরে পেল না এই বীর সন্তানকে। নেতাজী জীবিত কি মৃত, তা আজও আমরা সঠিক জানি না। ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই আগস্ট জাপান থেকে তাঁর বিমান দুর্ঘটনায় মৃত্যুর কথা ঘোষণা করা হয়। এই বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজীর মৃত্যু আজও নিঃসংশয়ে ভারতবাসী গ্রহণ করতে পারেনি। ভারতের অগণিত মানুষের বিশ্বাস আজও তিনি বর্তমান। তিনি ভারতবাসীর একান্ত প্রিয় নেতা। ভারতবাসীর হৃদয়-সিংহাসনে তাঁর আসন চির অম্লান হয়ে থাকবে।

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

"তোমার আসন শূন্য আজি, হে বীর পূর্ণ করো।"

অনুশীলনী

১। সুভাষচন্দ্রের কলেজ জীবনের ঘটনা বর্ণনা কর।
২। 'আজাদ হিন্দ ফৌজের' কথা কি জান?
৩। দেশের স্বাধীনতার জন্য সুভাষচন্দ্র যে সংগ্রাম করেছেন, তার ইতিহাস লিখ।
৪। নেতাজীর জীবনের মূলমন্ত্র কি?
৫। নেতাজীর মৃত্যু সম্পর্কে কি জান?

শহীদ ক্ষুদিরাম

(১৮৮৯—১৯০৯ খ্রীঃ)



"স্বাধীনতা লাগি অকাতরে তুমি
দিয়ে গেলে নিজ প্রাণ।"

ফাঁসির মঞ্চের প্রথম শহীদ বিপ্লবী ক্ষুদিরাম। ১৩ই ডিসেম্বর ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দের মেদিনীপুর জেলায় ক্ষুদিরামের জন্ম। পিতা ত্রৈলোক্যনাথ বসু নাড়াজোল রাজ-এস্টেটের তহশিলদার ছিলেন। পরপর দুই ছেলের মৃত্যুর পর ক্ষুদিরামের জন্ম। এ ছেলেকেও যমে কেড়ে নেবে—এই ভয়ে এক মুঠো ক্ষুদ নিয়ে অপরের কাছে ছেলেকে বেচে দিলেন তাঁর মা। ক্ষুদের বদলে বেচে দিয়েছিলেন, তাই নাম রাখলেন ক্ষুদিরাম।

ছেলেবেলাতেই ক্ষুদিরাম মা-বাবাকে হারালেন। সেই থেকে তিনি মানুষ হতে থাকেন তাঁর দিদির কাছে। দিদির নাম অপরূপা দেবী। অপরূপার স্বামী অমৃতলাল তমলুকের দেওয়ানী আদালতে কাজ করতেন। গ্রামের পাঠশালা ছেড়ে ক্ষুদিরাম ভর্তি হলেন হ্যামিলটন স্কুলে। অমৃতলাল বদলি হলেন মেদিনীপুরে। ক্ষুদিরাম তাঁর সঙ্গে গেলেন সেখানে। ভর্তি হলেন মেদিনীপুর কলেজিয়েট

স্কুলে। সত্যেন্দ্রনাথ বসু ছিলেন ঐ স্কুলের শিক্ষক। বিপ্লবীদলের নেতা সত্যেন্দ্রনাথ ক্ষুদিরামকে টেনে নিলেন ঐ দলের গুপ্তসভায়।

বিপ্লবী দলে যোগদান করে ক্ষুদিরাম লেখাড়ার কাজ থেকে অনেক দূরে সরে গেলেন। শুধু সমিতির কাজ আর অন্তরে উত্তেজনার আগুন। বিদেশী ইংরেজকে তাড়াতেই হবে। বিলেতি কাপড় পোড়াতে হবে—ক্ষুদিরাম দলনেতা। বিলেতি নুন আর চিনির গাড়ি লুট করতে হবে—ক্ষুদিরাম দলনেতা। মেদিনীপুরে শিল্প-প্রদর্শনীতে পুস্তক বিতরণ করতে হবে—এই কাজের ভার নিলেন ক্ষুদিরাম। সেই বইগুলোতে ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে বিপ্লবের কথা লেখা। হঠাৎ পুলিশ তাঁকে ধরতে এল, পুলিশের নাকে এক ঘুঁশি মেরে ক্ষুদিরাম গেলেন পালিয়ে। তিনমাস পর ধরা পড়লেন ক্ষুদিরাম। সবাই ভাবল এইবার বিপ্লবীদলের কর্মীরা ধরা পড়বে। পুলিশের দারুণ নির্যাতন সহ্য করলেন ক্ষুদিরাম। শুধু বললেন—আমি কিছু জানি নে।

সরকার তাঁকে ছেড়ে দিলেন—শুধু চিনে রাখলেন এই সত্যাশ্রয়ী বীর যুবককে।

এইবার এল জীবনের চরম ডাক—স্বাধীনতার সংগ্রাম। ইংরেজ সরকার চাইলেন বাংলাকে দু'ভাগ করতে। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের ঢেউ এসে লাগল মেদিনীপুরেও। সারা ভারতে বিদ্রোহের আগুন জ্বলল। তখনকার বাংলার তরুণ সম্প্রদায় বিবেকানান্দর বাণী ও ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের "আনন্দমঠ" থেকে প্রেরণা লাভ করেছিল। বিপ্লবীরা ভাবতেন ইংরেজকে এদেশ থেকে তাড়াতেই হবে। তাঁদের লক্ষ্য "জীবন-মৃত্যু পায়ের ভৃত্য, চিত্ত ভাবনাহীন।" সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হতে লাগলেন তাঁরা গোপনে। তৈরী হল অনেক বোমা।

বিদেশ থেকে এল নানা অস্ত্র। এই মুক্তি-সংগ্রামে ঋষি অরবিন্দ, বারীন্দ্রকুমার, সত্যেন্দ্রনাথ, হেমচন্দ্র চন্দ্র, হেমচন্দ্র কানুনগো, উপেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, উল্লাসকর দত্ত প্রভৃতি বীর সন্তানগণ যোগ দিলেন। এঁরা চির-নমস্য।

ঘটনাচক্রে বিপ্লবীরা ধরা পড়ল। কারও হল ফাঁসি, কারও দ্বীপান্তর। তখন কলকাতায় কিংসফোর্ড ছিলেন চীফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট—খুব অত্যাচারী শাসক। স্বদেশী আন্দোলনে "পিকেটিং" করে যে-সব ছাত্র ধরা পড়ত, তাদের তিনি নির্মমভাবে বেত মারবার আদেশ দিতেন। একবার সুশীল সেন নামে ১৬ বছরের একটি ছেলে বেত্রাঘাতে অচৈতন্য হয়ে পড়ে। ফলে সারা ভারত বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। ইংরেজ সরকার বাধ্য হয়ে কিংসফোর্ডকে বদলি করেন মজঃফরপুরে। বিপ্লবীরা ঠিক করলেন, কিংসফোর্ডকে সরিয়ে দেবেন পৃথিবী থেকে। তাঁকে হত্যা করার দায়িত্ব নিলেন ক্ষুদিরাম আর প্রফুল্ল চাকী। ঠিক হল রাতের অন্ধকারে কিংসফোর্ড যখন ক্লাব থেকে ফিটন গাড়ি করে বাংলায় ফিরবেন, তখন তাঁকে বোমার আঘাত করা হবে। ৩০শে এপ্রিল, রাত ৮টা। গাড়ি লক্ষ্য করে বোমা ছুঁড়লেন ক্ষুদিরাম। অত্যাচারী কিংসফোর্ড কিন্তু মরলেন না। মারা গেলেন দু'জন মহিলা। ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল পালিয়ে গেলেন। কিন্তু পুলিশ তাঁদের পিছু নিল।

প্রফুল্ল চাকী আত্মহত্যা করলেন, তবু ধরা দিলেন না। ক্ষুদিরাম এলেন পঁচিশ মাইল দূরে ওয়েনী স্টেশনে। শ্রান্ত-ক্লান্ত, দেহ। পিপাসার্ত ক্ষুদিরাম হঠাৎ ধরা পড়ে গেলেন।

বিচার শুরু হল। হত্যার অপরাধে ক্ষুদিরামের ফাঁসির হুকুম হল। ঘাতক ফাঁসির রশি পরাতে এল। সেই রশি তার হাত

থেকে কেড়ে নিয়ে নিজের গলায় পরলেন ক্ষুদিরাম। ফাঁসির মঞ্চে "বন্দেমাতরম্" শোনা গেল। হাসিমুখে শহীদ হলেন ক্ষুদিরাম। চির অমর হয়ে রইলেন তিনি। স্বাধীনতার তোরণে ক্ষুদিরামের এই আত্মত্যাগই আমাদের স্বাধীনতা এনেছে। গ্রাম্যকবি ক্ষুদিরামের ফাঁসি নিয়ে রচনা করেছেন গান :

"একবার বিদায় দে মা ঘুরে আসি।
দশমাস দশদিন পরে
জন্ম নিব মাসীর ঘরে (মাগো),
চিনতে যদি না পারিস মা, দেখবি গলায় ফাঁসি।"

অনুশীলনী

১। 'শহীদ' কথার অর্থ কি? ক্ষুদিরামকে শহীদ বলা হয় কেন? আরও দু'-একজন শহীদের নাম বল।

২। ক্ষুদিরাম কত সালে জন্মেছিলেন? তাঁর পারিবারিক পরিচয় দাও।

৩। ক্ষুদিরাম কার কাছে কিভাবে বিপ্লবের দীক্ষা লাভ করেন?

৪। ক্ষুদিরাম কোন্ ঘটনায় পুলিশের নাকে ঘুঁষি মেরেছিলেন?

৫। ক্ষুদিরামের সময় স্বদেশী আন্দোলনে যোগদানকারী আরও কয়েকজন মুক্তিসংগ্রামীর নাম কর।

৬। ক্ষুদিরামের সময়ে কে কলকাতার চীফ্ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন?

৭। পুলিশের হাতে ধরা পড়ার পূর্বে তাঁর সঙ্গে আর কে ছিলেন? তিনি কি করেছিলেন?

৮। ক্ষুদিরামের আত্মত্যাগের কাহিনী বর্ণনা ক।

বিদ্রোহী কবি নজরুল

(১৮৯৯—১৯৭৮ খ্রীঃ)



"আমি উন্মাদ, আমি উন্মাদ,
আমি চিনেছি আমারে, আজিকে আমার
খুলিয়া গিয়াছে সব বাঁধা।"

নজরুল ইসলাম। 'অগ্নিবীণা'র রচয়িতা বিদ্রোহী কবি নজরুল। কবির জন্ম ১৩০৬ সালের ১১ই জ্যৈষ্ঠ (ইংরেজী ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৪শে মে)। তাঁর পিতার নাম কাজী ফকির আহম্মদ এবং মাতার নাম জাহেদা খাতুন। বর্ধমান জেলার চুরুলিয়া গ্রামে বাস করতেন তাঁরা। ছেলেবেলায় নজরুল খুব দুষ্টু প্রকৃতির ছিলেন। তাঁর বাবা তাঁকে গ্রামের মক্তবে ভর্তি করে দিয়েছিলেন। সেখানে তিনি কিছু ফার্সী আর কোরাণ-শরীফ পড়েছিলেন। দশ বছর বয়সে তিনি মক্তবের পড়া শেষ করলেন। তখন তিনি উর্দু আর ফার্সী এমন সুন্দরভাবে উচ্চারণ করতেন যে, শুনে সবাই অবাক হয়ে যেতেন।

এর পরই নজরুলের লেখাপড়া গেল বন্ধ হয়ে। কারণ, তাঁর বাবা এই সময় মারা যান। দুঃখিনী মা ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের নিয়ে অকূল সাগরে ভাসলেন।

কিছুদিন পর নজরুল ঐ মক্তবেই শিক্ষকতা শুরু করলেন। কিন্তু এই ব্যবস্থা তাঁর অশান্ত মন কিছুতেই মেনে নিতে পারল না। অভিভাবকহীন নজরুলের মনটা লাগাম-ছেঁড়া ঘোড়ার মত যেদিকে ইচ্ছে ছুটে যেতে লাগল। তাঁর এক চাচা—নাম ছিল কাজী ফজলে করিম। তিনি ফার্সীতে ভাল কবিতা লিখতে পারতেন। তাঁর সেই কবি-প্রতিভার ছায়া নজরুলের জীবনেও পড়েছিল। কবি তাই অল্প বয়সেই নানা রকমের ফার্সী-বাংলা মেশান কবিতা লিখতে চেষ্টা করতেন। মাঝে মাঝে দু'-একটি কবিতা বেশ ভালও হয়ে যেত। পাশের গ্রামে একটি গানের দল ছিল। তারা যাত্রাগানের মত এক-রকম পালা গান করত। নজরুল মাঝে মাঝে তাদের জন্য পালাগান লিখে দিতেন। এতে তাঁর দু'-পয়সা রোজগারও হত। কিন্তু গ্রামের ঐ ছোট্ট জায়গায় তিনি নিজেকে ধরে রাখতে চাইলেন না। একদিন গ্রাম থেকে পালিয়ে চলে গেলেন আসনসোলে। সেখানে পাঁচ টাকা মাইনেতে ময়দা-মাখার কাজ নিলেন একটি রুটির দোকানে। দিনের বেলা ময়দা মাখেন আর রাত্রে অবসর সময়ে পুঁথি পড়েন ও গান গেয়ে বাজনা বাজিয়ে সবাইকে মাতিয়ে তোলেন। আসানসোলের দারোগা নজরুলের গুণে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে তাঁর গ্রামের স্কুলে ভর্তি করে দিলেন। ভাবলেন, এই ছেলেকে লেখাপড়া শেখাতে পারলে ভবিষ্যতে এর দ্বারা অনেক কাজ হবে। এই স্কুলে এক বছর পড়ার পর তিনি রাণীগঞ্জের হাইস্কুলে ভর্তি হলেন। কিন্তু তাঁর বাঁধন-ছাড়া মন স্কুলের বাঁধাধরা নিয়মের সঙ্গে কিছুতেই খাপ

অনুশীলনী

১। নজরুল ইসলামের বাল্যকাল সম্পর্কে যাহা জান বল।

২। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সঙ্গে কবি কিভাবে নিজেকে যুক্ত করেন ?

৩। নজরুলের কয়েকখানি প্রসিদ্ধ গ্রন্থের নাম কর।

৪। নজরুল ইসলামকে 'বিদ্রোহ কবি' বলা হয় কেন ?

৫। নজরুলের 'মার্চ' সঙ্গীতের কিছুটা অংশ আবৃত্তি করে শোনাও।

৬। কবির বর্তমান জীবনের কথা কি জান ?

৭। (ক) নজরুল ইসলামের জন্মস্থান কোথায় ?

(খ) বাল্যকালেই নজরুলের লেখাপড়া বন্ধ হয়ে যায়, কারণ ——।

(গ) আসানসোলে নজরুল কি কাজ করতেন ?

(ঘ) নজরুলের প্রসিদ্ধ কবিতাটির নাম ——।

বিধানচন্দ্র রায়

(১৮৮২—১৯৬২ খ্রীঃ)



নূতন বাংলার স্রষ্টা বিধানচন্দ্র রায় ১৮৮২ সালের ১লা জুলাই বিহারের পাটনা শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম প্রকাশচন্দ্র রায় এবং মায়ের নাম অঘোরকামিনী দেবী। পিতা ছিলেন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, মাতা ছিলেন খুব দয়াবতী রমণী। বিধানচন্দ্র মাতাপিতার কনিষ্ঠ সন্তান।

বিধানচন্দ্র বাল্যকালে অতিশয় মেধাবী ছিলেন। তিনি পাটনা থেকে বি. এ. পাশ করে কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ থেকে এল. এম. এস. পাশ করেন। মেডিক্যাল কলেজে হাউস-ফিজিসিয়ান পদে ডঃ রায় দু'বছর কাজ করেন। কাজ করতে করতে তিনি এম. ডি. উপাধি লাভ করেন। তারপর বিধানচন্দ্র বিলেত থেকে এম. আর. সি. পি. এবং এফ. আর. সি. এস. পাশ করে চিকিৎসা-কার্য

আরম্ভ করেন। ডাক্তার হিসাবে বিধানচন্দ্র টাকার জন্য কোন.দিন পীড়াপীড়ি করেননি।

সময় সময় এমনও হয়েছে যে, রোগীরা আর্থিক অবস্থা দেখে তিনি ফি তো নেননি, উপরন্তু নিজের পকেট থেকে ঔষধ ও পথ্য কিনে দিয়েছেন তাদের। খুব কম সময়ের মধ্যেই বিধান রায়ের নাম চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল।

মেডিক্যাল কলেজে যোগদানের পর তিনি স্যার আশুতোষের অনুরোধে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেটের 'ফেলো' পদে নির্বাচিত হন।

বিধানচন্দ্রের কর্মজীবন বহু ধারায় বিভক্ত। ১৯০৫ সালে লর্ড কার্জনের 'বঙ্গভঙ্গ' ব্যবস্থার বিরুদ্ধে দেশে আন্দোলন শুরু হয়। ইংরেজ সরকারের এই চক্রান্তের বিরুদ্ধে বিধানচন্দ্র সক্রিয়ভাবে আন্দোলনে যোগ দেন। এখান থেকেই বিধানচন্দ্রের স্বদেশী আন্দোলনের সূত্রপাত। মহাত্মা গান্ধীর পরমভক্ত বিধানচন্দ্র সর্বদা গান্ধীজীর সঙ্গে একত্রে কাজ করে গেছেন। ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর বাড়ির সামনে ওয়েলিংটন স্কোয়ারের (বর্তমান সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার) কংগ্রেস অধিবেশনে তিনি যোগদান করেন। এর কিছুদিন পর তিনি ব্যারাকপুর কেন্দ্র থেকে আইন সভার সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৩১—১৯৩২ সালে তিনি কলকাতার মেয়র নির্বাচিত হন। ইংরেজ শাসনের নিষ্ঠুরতার বিরুদ্ধে তিনি সর্বদাই সদর্পে প্রতিবাদ জানিয়েছেন। ১৯৪৭ সালে দেশ স্বাধীন হল। ১৯৪৮ সালে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী হন। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তিনি ঐ পদে অধিষ্ঠিত থেকে দেশের সেবা করে গেছেন। শাসনকার্য পরিচালনায় তাঁর দক্ষতা, নির্ভীকতা ও সততা সর্বজন-স্বীকৃত।

ইস্পাতনগরী দুর্গাপুর, চিত্তরঞ্জন রেলের কারখানা, লবণহ্রদ পরিকল্পনা, রাষ্ট্রীয় পরিবহণ, কল্যাণী উপনগরী প্রভৃতি বহু পরিকল্পনার রূপকার 'ভারত-রত্ন' বিধানচন্দ্র।

১৯৬১ সালের ১লা জুলাই দেশের প্রতিটি মানুষ যখন তাঁর একাশীতম জন্ম দিনের উৎসব সমারোহে মুখর, ঠিক সেই দিন এই মহান ব্যক্তিটি বঙ্গমাতার কোল থেকে চির বিদায় নিলেন। তাঁর অসমাপ্ত কার্য যেন পূর্ণ করার আকাঙ্ক্ষায় আমরা কবির সঙ্গে সুর মিলিয়ে প্রার্থনা করি—

"পূর্ণ হউক, পূর্ণ হউক, পূর্ণ হউক, হে ভগবান।"

অনুশীলনী

১। বিধানচন্দ্র কত সালে কোথায় জন্মগ্রহণ করেন? তাঁকে নতুন বাংলার স্রষ্টা বলা হয় কেন?

২। বিধানচন্দ্র রায়ের ছাত্রজীবন সম্বন্ধে সংক্ষেপে লিখ।

৩। পশ্চিমবঙ্গের উন্নতির জন্যে তিনি কি কি করেছিলেন?

৪। বিধানচন্দ্র কত সনে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী হন? তিনি কোন্ রাজনৈতিক দলের অনুগামী ছিলেন?

খাওয়াতে পারল না। তিনি স্কুলের বই ছেড়ে বাইরের বই পড়েন। পরীক্ষায় খাতায় কবিতা লেখেন।

নজরুল যখন ক্লাস টেন-এ পড়েন, তখন প্রথম বিশ্বযুদ্ধের দামামা বেজে উঠল। দলে দলে লোক পল্টনে ভর্তি হয়ে লড়াইয়ে যাচ্ছে। নজরুলও 'বাঙালী পল্টন'-এ নাম লিখিয়ে একদিন করাচী চলে গেলেন। বাঙালী পল্টন ভেঙে যাবার পর ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে নজরুল কলকাতায় ফিরে এলেন। এর আগে থেকেই মুসলমান সাহিত্য সমিতির পত্রিকায় ছোটগল্প ধরনের কয়েকটি লেখা বেরিয়েছিল। এর পর একে একে তাঁর বহু কাব্যগ্রন্থ রচিত হল। 'অগ্নিবীণা', 'বিষের বাঁশী', 'সর্বহারা', 'ফণিমনসা', 'দোলনচাঁপা' প্রভৃতি তাঁর প্রসিদ্ধ কাব্যগ্রন্থ। 'সঞ্চিতা' নামক কাব্যগ্রন্থে তাঁর শ্রেষ্ঠ কবিতাগুলি সংকলিত হয়েছে। তাঁর গানের সংখ্যা প্রায় আড়াই হাজার। এই গানগুলির মধ্যে কবির অকৃত্রিম স্বদেশানুরাগের পরিচয় পাওয়া যায়। এছাড়া তিনি অনেকগুলি শ্যামাসঙ্গীতও রচনা করেন।

১৯২১ সালে নজরুলের প্রসিদ্ধ 'বিদ্রোহী' কবিতাটি প্রকাশিত হয়। এই কবিতাটির মধ্য দিয়ে কবি অত্যাচারিত, নিপীড়িত পরাধীন মানুষের বিদ্রোহের কথা বলেছেন। দুরন্ত প্রাণের আবেগকে তিনি বিচিত্র ছন্দ ও ভাষায় প্রকাশ করেছেন।

"আমি চির দুর্দম দুর্বিনীত নৃশংস,
মহাপ্রলয়ের আমি নটরাজ, আমি সাইক্লোন, আমি ধ্বংস,
আমি মহাভয়, আমি অভিশাপ পৃথ্বীর, আমি দুর্বার,
আমি ভেঙ্গে করি সব চুরমার
আমি অনিয়ম উচ্ছল,
আমি দলে যাই যত বন্ধন, যত নিয়ম কানুন শৃঙ্খল।"

কার বিরুদ্ধে তাঁর এই বিদ্রোহ, তা আমাদের জানতে হবে। তাঁর বিদ্রোহ অন্যায় ও অসাম্যের বিরুদ্ধে। যেখানেই তিনি অন্যায় দেখেছেন, সেখানেই তাঁর লেখনী অগ্নিবর্ষণ করেছে। সেকালের ইংরেজ সরকার ছিল অত্যাচারী ও দুষ্কৃতকারী। হীন ষড়যন্ত্র করে যারা দেশের সিংহাসন দখল করে রেখেছে, তাদের বিরুদ্ধেই কবির যত বিদ্রোহ। এই বিদ্রোহের আগুন জ্বালিয়ে এগিয়ে যাবে দেশের তরুণেরা 'মার্চ' করে। নজরুলের 'মার্চ সঙ্গীত' রচিত হল—

"চল্ চল্ চল্
ঊর্ধ্ব গগনে বাজে মাদল,
নিম্নে উতলা ধরণীতল,
অরুণ প্রাতের তরুণ দল,
চল্ রে চল্ রে চল্।"

ধর্মের নামে যারা অধর্ম করছে, যারা জাতিভেদ বজায় রেখেছে, তাদের বিরুদ্ধেও কবির বিদ্রোহ সোচ্চার। কবি নিজের সম্পাদনায় 'ধূমকেতু' নামক পত্রিকা বের করলেন। এই পত্রিকা পড়ে ইংরেজ সরকার ক্ষিপ্ত হয়ে কবিকে গ্রেপ্তার করল। বিচারে তাঁর এক বছরের সশ্রম কারাদণ্ড হল।

ব্যক্তিগত জীবনে কবি ছিলেন প্রাণপ্রাচুর্যে ভরা। তিনি যেখানেই গেছেন, সেখানেই সকলকে হাসিতে, কবিতায়, গানে, গল্পে মাতিয়ে রেখেছেন। কিন্তু এই চির বিদ্রোহী কবির জীবন বড় দুঃখময়। বিগত কয়েক বছর ধরে মস্তিষ্কের রোগে তাঁর স্মৃতিশক্তি বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। অজস্র সঙ্গীতের স্রষ্টা নজরুল আজ সুরহারা। তাঁর এই নিস্তব্ধতা আমাদের কাছে বড়ই বেদনাদায়ক। বাঙালী কোনদিন ভুলতে পারবে না এই চির বিদ্রোহী কবিকে।